কুরবাতি ইরানী ও নবাবীদের ‘নহা’ সংগ্রহ ও বিচার: প্রসঙ্গ কারবালা

এম.ফিল(তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ) উপাধির জন্যে প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

গবেষক: সানাম নাসরীন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: 142371 of 2017-18

ক্রমিক সংখ্যা: MPCO194019

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭- ২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক: ড. সায়ন্তন দাশগুপ্ত

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা: ৭০০০৩২

২০১৯

JADAVPUR UNIVERSITY

KOLKATA- 700032

Department of Comparative Literature

Certified that the thesis entitled, **কুরবাতি ইরানী ও নবাবীদের 'নহা' সংগ্রহ ও বিচার: প্রসঙ্গ কারবালা,** submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in **Comparative Literature** of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is being carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at **Jadavpur**, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Examination Roll no. MPCO194019

Registration no. 142371 of 2017-2018

(Full signature of the M.Phil Student with
Roll number and Registration number)

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of **Sanam Nasrin** entitled **কুরবাতি ইরানী ও নবাবীদের 'নহা' সংগ্রহ ও বিচার: প্রসঙ্গ কারবালা**, is now ready for submission towards the partial fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in **Comparative Literature** of Jadavpur University.

Head	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC

Department of Comparative Literature

Scanned by CamScanner

মুখবন্ধ

কারবালা বা ইসলামী ইতিহাস নিয়ে আমার পূর্বে কোনো ধারণা ছিলনা, এই বিষয়ে কখনো গবেষণা করব সেই ভাবনাও কখনো আসেনি। এম.ফিলে প্রবেশের পূর্বে হঠাৎ করেই একদিন টেলিগ্রাফ পত্রিকায় বের হওয়া একটি প্রবন্ধের লিংক ফেসবুকে পাই। সেখান থেকে আমি প্রথম জানতে পারি যে মুর্শিদাবাদে হাজারদুয়ারীর কাছে কিছু সংখ্যক ইরানী গোষ্ঠীর বসবাস আছে। তাদের জীবন-যাত্রা এই যুগে দাঁড়িয়েও অনেকটা অবাক করে দেওয়ার মত বলে আমার মনে হয়েছিল সেই প্রবন্ধটি পড়ে। সেখানে খুব তাদের ব্যাপারে খুব সামান্যই তথ্য দেওয়া ছিল এবং জানানো হয়েছিল তারা ভারতবর্ষে দীর্ঘ দেড়শো বছরের বেশী থাকা সত্ত্বেও তাদের ভারত সরকার কোনও নাগরিকত্বের অধিকার দেয়নি। নাগরিক অধিকার ছাড়া আধুনিক যুগে বেঁচে থাকাটা কতটা কঠিন তা আলাদা করে আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা। এমন জনজাতিকে দেখার ইচ্ছা থেকেই এক সময় মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে গিয়ে সত্যই ইরানী জনজাতির সাক্ষাত লাভ হয়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে টেলিগ্রাফে দেওয়া তথ্য গুলির সত্যতা প্রথমবারেই যাঁচাই করেছিলাম। তাতে আমার সামনে ইরানী জনজাতিকে নিয়ে যে ধারণা জন্মেছিল তার বেশীরভাগই প্রত্যক্ষ করার পর বদলে গেল। এইভাবে এই বিষয়টি আমার নজরে আসে এবং পরে এটিকে গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্বাচন করি।

ইরানীদের মাতৃভাষা কুরবাতি, ভাষা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তাঁরা তাঁদের আইডেন্টিটিকে দীর্ঘ বছর ধরে বজায় রেখেছেন। এই কুরবাতি ইরানীদের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে নবাব বংশীয়দের বসবাস রয়েছে, বলাবাহুল্য বাংলার নবাবরা সকলেই ইরানী ছিলেন। বর্তমানে নবাবীরা তাদের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে নোমাডিয় কুরবাতি ইরানীদের মুর্শিদাবাদে বসবাস করার অধিকার দিয়েছে। আমি আমার কাজের মধ্যে নানা দৃষ্টিকোন থেকে নবাবী ও কুরবাতি ইরানীদের মধ্যে সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছি । কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাকে অনেক ছোটো একটি ক্ষেত্র নিয়ে চর্চা করতে হয়েছে। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ‘নহা’ নামক একটি সাহিত্যধারা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবে ইসলামীয় ইতিহাস, দর্শন তথা কারবালার প্রসঙ্গটি এসেছে। দুই জনগোষ্ঠী আলাদা হয়েও ধর্মীয় সংস্কৃতি কিভাবে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে

রেখেছে, এখান থেকে কিভাবে নতুন এক সাহিত্যধারা জন্ম নিয়েছে, ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক এই গবেষণায় তা দেখানোর চেষ্টা করেছি ।

গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে ইন্টারনেটে মুর্শিদাবাদি ইরানী জনজাতি বা জিপসীয় ইরানীদের নিয়ে নানা তথ্য খুঁজতে থাকি, এদের নিয়ে বাংলায় কোনও চর্চা হয়নি, এমনকি মুর্শিদাবাদের স্থানীয় অধিবাসীরা ইরানীয়দের নিয়ে বিশেষ তথ্য দিতে পারেন নি। সেই কারণে আমার গোটা গবেষণায় আমি নানা বইয়ের সাহায্য নিয়েছি বটে কিন্তু ইরানী বিষয়ক বা অন্যান্য তথ্য গুলি ক্ষেত্রসমীক্ষা করেই দিতে হয়েছে। এর পূর্বে যেহেতু এই বিষয়ে কোনও কাজ হয়নি সেহেতু এই বিষয় কেন্দ্রিক কোনও বই, জার্নাল, পত্রিকার সাহায্য বিশেষ ভাবে নিতে পারিনি।

মুর্শিদাবাদে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা প্রথামাবস্থায় মোটেই সহজসাধ্য ছিলনা। বহরমপুরের শান্তি গার্লস হোস্টেল থেকে বরাবর বহু সুযোগ পেয়েছি, এখানে থেকে আমার কাজ করা অনেক সহজ হয়েছে। এছাড়া লালবাগ শহরের বহু মানুষের থেকে আমি প্রভূত ভাবে উপকৃত হয়েছি। মেহফুজ এবং তার পিতা আব্দুল হক কাজের শুরু থেকে নানা প্রকার তথ্য দিয়ে বারবার বহু ভাবে উপকার করে এসেছেন এবং মুর্শিদাবাদের মত অচেনা স্থানে সে আমাকে আমার কাজে নানা ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করতে সাহায্য করেছেন। হাজারদুয়ারীর বহু মানুষের সঙ্গে আমার কাজের বিষয়ে কথা হলেও যাদের তথ্য ব্যবহার করেছি তাদের নাম গুলি উল্লেখ করছি- তালহা ইরানী, ফিরোজা ইরানী, লেবা ইরানী, নিসার ইরানী, নাজির ইরানী, সাবনাম ইরানী, সায়েদ ওয়াসেক বাহাদুর মির্জা, আতহার মির্জা, আফাক মির্জা, সায়েদ রাজা আলি মির্জা, রেজা আলি মির্জা, আজাল মির্জা, ইরফান আলি, আশিক আলি, মেহেদি আলম, সায়েদা ফিরদৌসি, ইমাম হাসান, সানিয়া ইরানী প্রমুখ। সকলের নাম উল্লেখ না করলেও আমি প্রত্যেকের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ থাকব। তাদের তথ্য ছাড়া আমার কাজটি শুরু করাই সম্ভব ছিলনা। এছাড়া কিংশুক দাস নানা বই ও তথ্য দিয়ে বরাবর সাহায্য করেছে।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-আধ্যাপিকা সকলেই আমাকে সর্বক্ষেত্রে তাদের সুচিন্তিত উপদেশ দিয়েছেন। আমার গাইড ড. সায়ন্তন দাশগুপ্ত এবং ড. সুমিত কুমার বড়ুয়া বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে কাজ করার প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁরা আমার কাজ পূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন বিভিন্ন ভাবে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ধৃষ্টতা আমার নেই। এছাড়া ড. কবিতা পাঞ্জাবি ও ড. ঈপ্সিতা হালদারের দেওয়া উপদেশ আমার কাজের পথকে সহজ করেছে।

সূচিপত্র

ভূমিকা পৃ. ৬-২০

প্রথম অধ্যায়: মুর্শিদাবাদী শিয়া সম্প্রদায় ও মহরমের আচার-অনুষ্ঠান পৃ. ২১ - ৪১

- ভূমিকা
- মুর্শিদাবাদী শিয়াপন্থিদের মহরম পালন
- মুর্শিদাবাদী কুরবাতি ইরানীদের পরিচয়
- মুর্শিদাবাদে ইরানী সংস্কৃতির পত্তন
- উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায়: ক্ষেত্র সমীক্ষায় সংগৃহীত নির্বাচিত নহার আলোকে কারবালা প্রসঙ্গের পুনর্বিবেচনা পৃ. ৪২-৭২

- ভূমিকা
- কারবালার ঘটনা ও নহা সম্পর্ক
- হোসেন পরবর্তী শিয়া মতাদর্শের উত্থান ও তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস
- ভারতবর্ষে নহা চর্চার ইতিহাস
- নহা ও তার
- উপসংহার

তৃতীয় অধ্যায়: নির্বাচিত সালাম ও নহাগুলির পাঠ বিচার পৃ. ৭৪-১৭৬

- ভূমিকা
- সংগৃহীত সালাম
- সংগৃহীত নহা

উপসংহার পৃ. ১৭৭-১৭৯

নির্বাচিত চিত্র পৃ. ১৮০-১৮৬

গ্রন্থপঞ্জী পৃ. ১৮৭-১৯০

ভূমিকা

মানুষের চরমতম দুর্ভাগ্য হল তাঁকে ধর্ম দিয়ে চিহ্নিত করা। মানুষের বয়সকাল বিচার করে জানা যায়, মানুষ টিকে আছেন চল্লিশ হাজার বছর ধরে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ধর্মের বয়স খুব জোর পাঁচ হাজার বছর। স্বভাবতই মনে হতে পারে– বিনাধর্মে মানুষ পয়ঁত্রিশ হাজার বছর বেঁচে ছিলেন কিভাবে? চল্লিশ হাজার বছর পূর্বেকার মানুষের সঙ্গে আজকের মানুষের বিস্তর ফারাক। এই ফারাককে যদি মানুষের সার্বিক উন্নয়নের প্রসারের মানদণ্ডে দেখা যায়, তাহলে প্রশ্ন আসে- এই প্রসারের ধর্মের প্রভাব কতখানি? হয়ত নেই, কিংবা আছে। কিন্তু কারণ যাইহোক, রাজনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষানীতি এবং আমাদের বৈষয়িক জীবনে ধর্মের প্রভাবকে আজ আমরা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারিনা। ধর্মই আজ সর্বাধিক আধিপত্য বিস্তার করেছে আমাদের সমাজ জীবনে এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি করছেন, ব্যবসা করছেন বর্ণহিন্দু এবং অভিজাত মুসলমানরা। কেননা তাদের হাতেই আজও আমাদের সমাজের কাঠামো ধরা আছে। এই ধর্মের বাইরেও সমাজের বৃহৎ অংশের জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির এক ঐতিহ্যকে বুকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছেন। এটাই লোকজীবনের ধারা যা লোকসংস্কৃতি নামেও অভিহিত। লোক ঐতিহ্যের এই ধারায় তথা মুর্শিদাবাদি সংস্কৃতিতে যে ত্রিধারা নজরে আসে তা হল –

১) মুসলিম ঐতিহ্যের ধারা,

২) হিন্দু ঐতিহ্যের ধারা,

৩) হিন্দু মুসলিম মিশ্র ঐতিহ্যের ধারা।

মুসলিম ঐতিহ্যের ধারাটিকে পুষ্টি যোগাচ্ছেন অভিজাত মুসলমান তথা মৌলভী, মওলানা ও আলেম সম্প্রদায়। হিন্দু ঐতিহ্যের ধারাটিও একইভাবে অক্ষত রেখেছেন বর্ণহিন্দুরা। এই দুই ধারায় সবল সুঠাম দেহে রয়েছে প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের মোড়ক। এই দুই শ্রেণি সংখ্যায় নগণ্য হলেও দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই ধর্মীয় মূল্যবোধের বেড়া ভেঙে গড়ে উঠেছে মিশ্র সংস্কৃতি তৃতীয় ধারাটি, যার মধ্যে রয়ে গেছে সনাতন এবং আধুনিক, হিন্দু এবং মুসলমান, মানবতাবাদী ধর্মের সংমিশ্রণ। এই-ই আমাদের লোকজীবন। বাঙালী মুসলিমের লোকজীবন। কারণ বাঙালি মুসলমান অধিকাংশই অন্ত্যজ শ্রেণির হিন্দু এবং বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত; তাঁরা ধর্মান্তরিত হলেও পুরনো সংস্কৃতিকে ছেড়ে দিতে পারেনি। সনাতন সংস্কৃতিতে নতুন সংস্কৃতির সংমিশ্রনে গড়ে

উঠেছে এই মিশ্র সংস্কৃতির ধারা। এই-ই হচ্ছে মুর্শিদাবাদের বাঙালি মুসলিমদের লোকজীবন। মুর্শিদাবাদের মুসলিমদের লোকজীবন ও লোকচর্চার ধারায় কোরান, হাদিস ও ইসলামি বিধান জায়গা করে নিলেও– তার জনজীবনে সমান্তরালে চলে আসছে এক প্রথাগত লোকবিশ্বাসের ধারা। বরং একে Applied Religious Culture হিসাবে অভিহিত করা যায়। ধর্মীয় বিধানের মূলসূত্রগুলি থেকে আমাদের প্রায়োগিক জীবনের এই ধারা কতটা সরে এসেছে তা না জানতে পারলে লোকজীবনের আসল তত্ত্বটি অজ্ঞাত থেকে যায়। প্রায়োগিক জীবনের এই ধারাটিকে ধর্মীয় বিধানের পন্থা হিসেবে মেনে নিয়ে আমরা অনেকে বিভ্রান্ত হই। কারণ রিলিজিয়ন ও কালচার এক নয়। রিলিজিয়ন হচ্ছে Conservative and static অন্যদিকে Culture হচ্ছে Comprehensive, dynamic and creative বরং বলা চলে, রিলিজিয়ন কালচার নয়– কালচারের অংশমাত্র।

প্রত্যেকটি ধর্মের জন্মই তার স্থানীয় লৌকিক বিশ্বাস এবং প্রথার উপর ভিত্তি করে। ধর্মীয় বিধানও নির্মিত হয় সেই সব প্রথাকে ভর করে। ফলে প্রত্যেক ধর্মের বিধানে গোপনে রক্ষিত আছে তার লোকবিশ্বাস। ইসলাম কনিষ্ঠতম সেমিটিক ধর্ম। তাই হজরত মোহম্মদ (সাঃ) এর প্রচারিত ধর্মের আচার অনুষ্ঠান ও সাংবিধানিক ক্রিয়াকলাপে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন আরবীয় ও ইহুদীদের লোকবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাদের সেই বিশ্বাসের সংস্কার করেছেন মোহম্মদ। এই আলোচনা মূলত মুর্শিদাবাদি কুরবাতি ইরানীগোষ্ঠী এবং নবাব পরিবারের গড়ে ওঠা ধর্মীয় বিশ্বাস কেন্দ্র করে। আর তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে যে সাহিত্যধারা মুর্শিদাবাদী নবাব ঘরানা থেকে উঠে সেই বিষয়টিতেও আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রাচীন আরবীয়রা চান্দ্র ও সৌরবর্ষের নিয়ম অনুসারেই দিন বছর গণনা করতেন। তাদের ঋতু নির্ধারনও ছিলো এই নিয়ম অনুসারেই। হজরত মহম্মদ নির্দেশিত প্রত্যেকটি উৎসব ও পার্বন এই চান্দ্রমাস বা সৌরবর্ষ কেন্দ্রিক। চান্দ্র মাসের বছর শেষ হয় ৩৫৪ দিনে। সাধারণ বৎসরের হিসাবে যা এগারো দিন কম। এর ৩৩ টি মুসলিমবর্ষ ৩২ টি সৌরবর্ষের সমান। মুসলিমদের ব্যবহৃত মাস গুলি হল – ১) মহরম, ২) সফর, ৩) রবি-উল-আওয়াল, ৪) রবি-উস-সানি্, ৫) জমাদি-উল্-আওয়াল, ৬) জমাদি-উস্-সানি, ৭) রজব, ৮) শাবান, ৯) রমজান, ১০) শাওয়াল, ১১) জিলক্বদ্, ১২) জিলহজ্ব।

এই ইসলামি মাসের সঙ্গে তার পরব গুলির সম্পর্ক নিয়ে একটি প্রচলিত ছড়া আছে :

“মহরমে ডাহের চাঁদ দশ দিনে খানা

শফর তেজির চাঁদ ত্রিশ দিনে মানা

রবিয়ল আওয়ালের ওয়াকাতের চাঁদ বারো দিনে বাতি

রুমজানের চারচাঁদে করিবেক শাদী।

শাবানে শবেবরাতে চাঁদ চৌদ্দ দিনে বাতি –

রমজানেতে রোজা আর শওয়ালেতে বিয়ে ঈদ

জেলকাদতে কাম নাই জ্বেলহজ্বে বকরীদ" [১]

মুর্শিদাবাদে শিয়াপন্থিদের একাংশে মহরমকে কেন্দ্র করে সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছে। শোকগাথা রচনা করে পাঠ করা হয় এই দিনটিতে। বাংলায় শোকগাথা রচনার নিজস্ব কোনও ঐতিহ্য নেই, উর্দু সাহিত্য থেকে প্রভাবিত হয়ে মুর্শিদাবাদের ভারতপুর, জঙ্গীপুরের দিকে অনুবাদ করা নহার প্রচলন আছে। তবে হাজারদুয়ারীতে বহু উর্দুভাষী বসবাস থাকায় সেখানে উর্দুতে নহা সংস্কৃতির আলাদা ঘরানা তৈরি হয়েছে। শোকগাথা গুলির পৃষ্ঠপোষক হলেন নবাবীরাই, কিন্তু ইরানীরা মুর্শিদাবাদের বসবাসের পর থেকে নহা ও মার্সিয়া সংস্কৃতি তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

মাতম ও মজলিশ

মহরম পালন মূলত শিয়াকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠান শব্দটি যুক্ত করার কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশষ কোরান বা ঘটনাকে উদ্‌যাপন বা স্মরণ করার জন্যে বিশেষ আয়োজন-ই হল অনুষ্ঠান। সুন্নি মুসলমানরা এই দিনটিকে স্মরণ করেন ব্রত পালন, নামাজ, কোরাআন পাঠের মধ্যে দিয়ে। মুসলিম সুন্নি পরিবারের জন্মানোর কারণে মহরমের সময়ে শিয়া মুসলমানদের নিজের আঘাত করার প্রসঙ্গে অনেককে প্রশ্ন করায় তারা জানিয়েছে হাসান-হোসেনের মৃত্যুর কারণ শিয়ারা নিজেরাই। আগে বিষয়টি নিয়ে ভাবনার অবকাশ হয়নি, এখন মহরম কেন্দ্রিক কাজ করার সুবাদে এক শিক্ষকের কাছে এই বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান- হোসেন মৃত্যু নিয়ে শিয়াদের ওপর যে দোষারোপ করা হয়, সেটি আসলে সঠিক ভাবে বিচার না করেই বলা হয়ে থাকে। শিয়া আইডিওলজিকে অন্য ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে শিয়া সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতামত তৈরি

[১] বিশ্বাস, নুরুল আমিন (২০১১) । *মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানস*। কলকাতা: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন।

হয়েছে। ইমাম হোসেনের পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে রক্ষা করার জন্যে। আর বিলাপ করার কারণ হিসাবে কোনো কোনো শিয়া মুসলিমরা কারণ দেখিয়েছেন একজন নেতা তার অনুসারীদের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন, এর ত্যাগের মূল্য কোনো কিছুর বিনিময়ে শোধ করার নয়। সেক্ষেত্রে বিলাপ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প কিছু করার উপায় নেই। তাই বিলাপের মধ্যে দিয়ে তাঁরা 'আকা' বা অধীশ্বরকে স্মরণ করেন। তারা মনে করেন স্বয়ং রাসুলের কন্যা ফাতিমা বিলাপ করার প্রথাকে মান্যতা দিয়েছিলেন, এই প্রথা পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন থাকবে। একসঙ্গে মজলিশ করা ছাড়া ব্যক্তিগত মাতম করেন শিয়া পন্থিরা, হোসেন এবং তার পরিবার ও অনুসারীদের যারা কারবালার ঘটনার ভুক্তভোগী- তাদের প্রতি নিজেদের এবং ব্যক্তিগত সমবেদনা জানানোর একটি পথ বিলাপ করা। কারবালার শহীদদের পরিবারের যন্ত্রণার সঙ্গে শরিক হওয়া জন্যে বিলাপের পথ বেছে নিয়েছেন। শিয়া পরিবারে কোনো শিশু যখন বড় হতে থাকে, তাদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে নহা বা মার্সিয়ার মত শোকগাঁথা গুলির প্রভাব অত্যন্ত গভীর। ঘরে ঘরে মহরমের সময়ে নহা বা মার্সিয়া সুর করে পড়ার মহড়া চলে। শিশুমন নহা বা মার্সিয়ার গুলির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারেনা ঠিকই কিন্তু হোসেন প্রেমের ভিত্তিভূমি ছোটো থেকেই তৈরি হতে থাকে। শুধু তাই নয় নহা বা মার্সিয়া সুর করে পাঠ করা শিশুদের জন্যে বাধ্যতামুলক থাকে, মহরমে বিলাপ গাওয়া শিয়াদের ধর্মীয় প্রথা হিসাবে প্রবেশ করে যাওয়ায় ছোটো থেকে শিয়া শিশুরা বিলাপ করার প্রতি সম্মান জানাতে শেখে। একটা সময় তারা নিজেরা মজলিস পরিচালনা করতে শিখে যায়। ছোটোদের পরিচালিত মজলিস 'বাচ্চো কি মজলিস' নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের চক্ এলাকায় একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, সেটই মহরম মাসের দশ দিন যাবৎ চলতে থাকে। সেখানে বর্তমানে মহরম কেন্দ্রিক বিষয়ের উপর শিশুদের নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান চলে। সেখানে প্রত্যক্ষ করেছি যে একটি শিশু কিভাবে নহা বা মার্সিয়া পাঠের মধ্যে দিয়ে মজলিশ পরিচালিত করে। তবে বড়দের মজলিশে বিলাপের সঙ্গে বিলাপকারীরা যে ভাবে নিজেদের একাত্ম করে নেন, সেই আবেগের গম্ভীরতা শিশুদের মজলিশে নেই, কারণ আবেগের গভীরতা বুঝে নিয়ে নিজেকে একাত্ম করা মত মানসিক স্তর সেই মজলিশকারী শিশুর গঠিত হয়নি।

মজলিশগুলির বিলাপ ব্যক্তিগত বিলাপের থেকে আলাদা। মজলিশে উপস্থিত থাকলে দেখা যায় বেশির ভাগ নারীরা[২] অঝোরে কাঁদতে থাকেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেউ কারো চোখের জল মুছিয়ে দিতে আসেন না, বা

[2] নারী মজলিশ বলার কারণ আমি একজন নারী হওয়ার কারণে নারীদের মজলিশে শরীক হয়ে তাদের বিলাপ করার ধরণকে প্রত্যক্ষ করেছি। তবে নারী-পুরুষ আলাদা আলাদা মজলিশ হয়। আবার একসঙ্গে কোনো মজলিশ আয়োজিত হলে নারী ও পুরুষদের জন্যে আলাদা বসার ব্যাবস্থা থাকে।

সমব্যথী হন না। কারণ উপস্থিত মাতমীরা (বিলাপকারী) কেউ কারো সমব্যথী নন। তারা সমব্যথী হচ্ছেন হোসেনের পরিবারের প্রতি। যদিও হোসেন ও তার পরিবারের প্রতি অশ্রুবর্ষন করার আরেকটি মুখ্য উদ্দেশ্য- মুসলিমদের বিশ্বাস রাসুল কন্যা বিবি ফাতিমা হলেন ইহলোক ও পরোলোকের সর্দারনী বা অধিনেত্রী, স্বয়ং আল্লহপাক অশেষ গুনের জন্যে বিবি ফাতিমাকে 'খাতুন-এ-জান্নাত'[৩] খেতাবটি দিয়েছেন। শিয়ারা বিশ্বাস করেন যাঁরা রাসুলের পরিবারের ত্যাগকে স্মরণ করে চোখের জল ফেললে, রাসুল কন্যা তাঁদের চোখের জলকে মুক্তাতে পরিবর্তিত করে জান্নাতে মুক্তার ইমারত বানিয়ে রাখবেন ও তাঁদের জন্যে বিশেষ উপহার দেবার জন্যে আল্লহর কাছে সুপারিশ করবেন। এক শিয়া নারী মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর সন্তানদের কাছে দাবি করে করেন তাঁর মৃত্যুর পার তাকে কাফনে জড়িয়ে বিদায় দিলেও তার সঙ্গে দুটি জিনিস যেন দাফনের সময় সঙ্গী হিসাবে সঙ্গে পাঠানো হয়, এক কারবালার মুজাহিদদের প্রতি যখন চোখের জল ফেলতেন তখন যে রুমাল দিয়ে তিনি চোখ মুছতেন সেই রুমাল এবং দুই কারবালার মাটি[৪]। এই উদাহরণ দেওয়ার কারণ তাদের যে একনিষ্ঠ ভক্তি এর জন্যে তাদের চাওয়া এইটুকুই। তাঁদের ভক্তির এমন একাধিক নিদর্শন বর্তমান। এর থেকে প্রমাণিত হয় এত বছর পূর্বে যারা শাহাদাত পেয়েছিলেন তাঁদের শাহাদাত বরণের মূল্য তাঁর আনুসারীরা আজও দিচ্ছেন এবং হোসেন ইসলামকে রক্ষা করার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, তাঁর সেই উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়নি। তবে মুর্শিদাবাদে যাঁরা শোকের কবিতা গুলো পাঠ[৫] (জাকিরা) করছেন তাঁরা কবিতা পাঠের মধ্যে মধ্যে চোখের জল ফেলার গুরুত্ব বোঝাতে চান, যদিও গুরুত্ব গুলো মৃত্যু পরবর্তী উপহার লাভ কেন্দ্রিক। ফলে চোখের জল ফেলার সঙ্গে এই ক্ষেত্রে কতটা আবেগের মিশ্রণ আছে প্রশ্ন থেকে যায়। মহরমকে কেন্দ্র করে শিয়াদের মধ্যেই একাধিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন এক শিয়া মুসলিম মহরমকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, মহরমের দিনে গান-বাজনা অবশ্য করা যায়, হোসেন মৃত্যুবরণ করেছেন তা অবশ্যই মর্মান্তিক, কিন্তু তিনি তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে ইসলামের জয় ঘোষণা করে গেছেন, সেই কারণের এমনদিন দুঃখ পালনের জন্যে নয়। আবার কেউ কেউ

---

[৩]'খাতুনে জান্নাত' অর্থাৎ জান্নাতের নেত্রী বা প্রধান।

[৪] মহরমের ১০ তারিখ থেকে ৪০ দিন পর নাজাফে অনুষ্ঠিত আরবাঈন অনুষ্ঠানে শরীক হতে যান পৃথিবীর সব প্রান্তের মুসলিমরা। সেই সুযোগেই বেশীর ভাগ শিয়ারা কারবালার মাটি নিয়ে আসেন। এই মাটিকে 'শেফা' (ওষুধ) হিসাবে মনে করেন মুসলিমরা। বিশেষ করে শিয়ারা।

[5] যারা কবিতা পাঠ করেন তাদের *জাকিরা, জাকির,* বলা হয়।

জাকিরা[৬] মজলিশকারীদের সমালোচনা করে বলেছেন, মজলিশকারীরা নানা উদাহরণ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শ্রোতাদের মগজ-ধোলাই করেন, কিন্তু নিজেকে আঘাত করা, কান্না-কাটি করার মত প্রথা গুলিতে অংশগ্রহন করেন না। একাধিক মতামত থাকলেও যারা মতামত দিয়েছেন তাদের সংখ্যা নেহাতই নগণ্য।

মাতম

মাতম করা শিয়া আইডেনটিটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাতমের সময় সকল শিয়ারা কালো পোষাক পরিধান করেন বেশিরভাগ। তাদের অনুষ্ঠান গুলিতে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থাকার কিছু শর্ত পূর্বে জেনে নিয়েছিলাম। কালো পোষাক পরিধান করে শিয়া অনুষ্ঠান গুলিতে যখন অংশগ্রহন করেছি তখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলাম আমার পরিধেয় কালো পোশাক পরার উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে তাদের মধ্যেকার একজন হিসাবে মনে করা- আমার সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে[6]। তাদের মাতম করার পদ্ধতি, শারীরিক অঙ্গ-ভঙ্গি, বিশেষ ভাষা ব্যবহার এসব কোনো কিছুতেই আমি অভ্যস্ত নই। আর মাতমের বিষয়টি বুঝে নিয়েও ন্যূনতম যে টুকু করার, হাত দিয়ে হালকা ভাবে বুক চাপড়ানো সেটারও ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছিলাম না। আর মুসলিম হওয়া স্বত্তেও তাদের মত হুসেন কে কেন্দ্র করে আবেগে ভেসে যেতে পারিনি। মাতম করা ও তার সঙ্গে বুক চাপড়ানো শিয়া আইডেন্টিটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুন্নি মুসলিমরা এই ভাবে বুক চাপড়িয়ে মাতম করার পক্ষে অসম্মতি জানায় ও বিশ্বাস করে রাসুলের জীবিত কালে কারো মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কোনো মাতমের ইতিহাস পাওয়া যায়না, শিয়ারা এই মতামতের পক্ষে ন্যায় সংগত যুক্তি দেবার চেষ্টা করেন বারবার। কারণ শিয়াদের উত্থান হচ্ছে আলির সময়[7] থেকে অর্থাৎ রাসুলের মৃত্যুর পর। শিয়াদের মাতমের ট্রাডিশন শুরুই হচ্ছে কারবালার ঘটনার পর। একাধিক যুদ্ধের মুখোমুখিই হোসেন পূর্ববর্তী নেতা হলেও কারবালার মত এহেন মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত আর নেই। নহা, মার্সিয়া পাঠের মধ্যে দিয়ে মাতম করা হলেও এরই মধ্যে রাসুল, হজরত

[6] মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির ইমামবাড়ি স্থানটিতে হওয়া মাতম অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিয়া সংস্কৃতির দিক গুলি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ৯ মহরম, ১৪৪০ হিজরি, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ।

[7] হজরত আলি খিলাফতের কাল ৬৫৬-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ, রাসুলের মৃত্যুর পর যারা আলিকেই প্রথম ইমাম ও খলিফা হিসাবে স্বীকার করেছিলেন তারাই শিয়া নামে পরিচিত হয়।

আলি, তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হোসেন,[৮] এবং ইমাম আবেদিন থেকে ইমাম মেহেদি অবধি সকল ইমামের নাম স্মরণ করেন। সব বয়সের, নারী-পুরুষ সকলেই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। হুসেন তার পরিবারের ওপর যে অত্যাচার হয়েছিল সেই দিনের কথা মনে করে নিজেকে কারবালার চরিত্র গুলির সঙ্গে একাত্ম করতে চান মাতমীরা।

মাতমকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে – এক, সাধারণ নহা, মার্সিয়া পাঠের মধ্যে দিয়ে বিলাপ করা; দুই, ইন্সট্রুমেন্টাল মাতম, অর্থাৎ যে মাতম করতে বাইরের থেকে জিনিস পত্রের প্রয়োজন পড়ে, এই ধরণের মাতমে নিজেকে আঘাত করা হয় ছুরি, ব্লেড, কাঁটাযুক্ত তার, তরোয়াল, চাবুক মাধ্যমে, এই পদ্ধতিতে মাতম হলে 'খুন-এ-মাতম' বলা হয়। কেউ বা আগুনের (জ্বলন্ত কাঠ কয়লা) ওপর হেঁটে আগ-কা-মাতম পালন করেন। এই মাতম করার পিছনে একটি সাঙ্কেতিক উপস্থাপনা বা Symbolic Representation আছে। যখন এক মাতমকারী নিজেকে আঘাত করে রক্তপাত করেন, তখন তিনি তার শরীরকে কারবালার যুদ্ধক্ষেত্র বা 'কাত্‌ল-গাহ্' মনে করেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যতটা রক্তপাত হয়েছিল সেই ঘটনাকে মনে নিজের শরীর থেকে রক্ত বের করে কারবালার ঘটনাকে জীবিত রাখতে চান।[৯] এই রক্তপাত করাকে শিয়াদের মধ্যে অনেকে নাকচ করেন। কেউ কেউ মনে করেন এটি করা একাবারে গোনাহ্ বা পাপ ও নিষিদ্ধ। সমালোচকরা বলেন রক্ত যেহেতু পবিত্র নয়, তাই যখন আঘাত করে সারা শরীর থেকে রক্ত পড়ে তখন গোটা শরীরটাই অপবিত্র হয়ে যায়। সেই সঙ্গে যারা মাতম করে তারা দিনের ৫ বার ফরজ (আবশ্যিক) নামাজ পরিত্যাগ করছে। মাতম করা আবশ্যিক নয় বা ধর্মীয় বিধানেও এই নিয়ে কোনো নির্দেশ নেই, অনির্দেশিত আচার পালনে আবশ্যিক ভাবে নির্দেশিত নিয়ম পালন ভঙ্গ করা একেবারেই শ্রেয় নয়।

মহরমের ১০ তারিখ বা আশুরার দিনে সবচেয়ে তীব্র ভাবে খুন-এ-মাতম হয়ে থাকে। আর এই মাতম শিয়া পন্ডিতের কাছে অধিক সমালোচিত হয়েছে । কিন্তু শিয়াদের একশ্রেণি এই মাতমের পালনের মধ্যে দিয়ে নিজের শরীরকে কারবালার যুদ্ধ ক্ষেত্র মনে করে রক্ত ঝরিয়ে ওই মর্মান্তিক ঘটনার রেষকে জিইয়ে রাখতে

[৮] কারবালার নৃশংসতার পর আপন জনকে হারিয়ে যারা জীবিত ছিলেন তারা সকলেই নারী। সেই নারীরা হলেন জয়নব, সাখিনা ,ফারওয়া, রুবাব, কুবরা, ইমাম হোসেন। ইমাম হোসেনের নাম উল্লেখ্য কারণ তিনি সবার শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে যান। নিজে হাতে তার সন্তান সন্ততির মৃতদেহ তুলেছেন, ব্যথায় আকুল হতে দেখেছেন, পিপাসায় মরতে দেখেছেন তাও তিনি মাথা নত করেন নি। এই কারণে হোসেনের জবানীতে বহু শোকগাথা রচিত হয়েছে।

[9] Hyder, Sayed Akbar (2005). *Reliving Karbala*. New York: Oxford University. P: 53

চায়। যারা ইন্সট্রুমেন্টাল মাতম করে তাদের পক্ষে অনেক যুক্তি আছে, যেমন পরবর্তী ইসলামীয়দের জন্যে হোসেন ও তার সাথীরা প্রাণ দিয়েছেন তার ত্যাগের সামনে শিয়াদের কেউ কেউ নিজ শরীর থেকে রক্তপাত করে একটি নিবেদন করেন মাত্র। আরেকটি যুক্তি মুর্শিদবাদি শিয়ারা দিয়েছেন, তরোয়াল, খঞ্জর, ব্লেড ইত্যাদি দিয়ে নিজেকে আঘাত করার পর অচৈতন্য হয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক, এমনকি এই আঘাত প্রাণঘাতক ও হতে পারে। কিন্তু প্রাণহানি হয়েছে এমন নজির মোটেই নেই, বরং খুন-এ-মাতম করার সেই দিনেই তারা সুস্থ হয়ে যায়। ক্ষতস্থান গুলি নিয়ে তারা দিব্যি ভালো ভাবে চলা ফেরা করতে পারে, এই বিষয়টি অনেকটা অলৌকিকের মতো কাছে ফলত নিজেকে আঘাত করার বিষয় নিয়ে তাঁদের মনে কোনো ভীতি কাজ করে না। আঘাত করার কয়েক ঘন্টার মধ্যে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা ক্ষতের যে যন্ত্রণা তা অতি শিঘ্রই সেরে ওঠে বলে রক্তপাত করার প্রথাটি এতোটা তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে একশ্রেণির শিয়াদের কাছে। এই কারণে আত্ম-নিগ্রহ করা বিফলে যাচ্ছেনা বলে তারা মনে করেন। আত্ম-নিগ্রহ করার বিষয়টি তিনভাবে দেখা যায় এক ঐতিহাসিক, এইখানে ভাবা হয় নিজের শরীরকে কারবালার মাঠ মনে করে রক্তপাত করা হয়, শরীরটা Signifier মত কাজ করে[১০]; দুই সাম্প্রদায়িক দিক থেকে ভাবা হয় একটি সম্প্রদায় এই বিশেষ প্রথা পালনের মাধ্যমে নিজেদের আইডেন্টিটিকে স্বতন্ত্র রাখছে, ও নিজেদের মধ্যে একতাকে বজায় রাখার খুব বড় উপায় হিসাবে দেখছেন শিয়ারা এই প্রথাকে, বুক চাপড়ানো শিয়াদের Identifier হিসাবে কাজ করে; তিন নৈব্যক্তিক দিক, এখানে ভাবা হয় যখন কোনো ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে রক্তপাত করেন (masochism) তখন তাদের কাছে দৈহিক যন্ত্রণার ভাবনা প্রতিপাদ্য নয়, তারা আরো বৃহত্তর স্বার্থে রক্তপাত করে কারবালাকে জীবিত রাখছেন প্রজন্ম কি প্রজন্ম ধরে এই প্রথার মাধ্যমে। দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া থেকে যারা ভারতে এসছেন তাদের কাছে রক্তপাতের বিষয়টি একেবারে নতুন নয় Roy Mottahedeh বলেছেন –

> "Self-mutilation in emulation of the 'passion' of heroes who are human yet divine is no stranger to the West: flagellants who whipped themselves both in penance and in remembrance of the scourging and crucifixion of Jesus appeared in almost every western European country in the Middle Ages, sometimes with the disapproval of the Church. Sometimes, like the group of flagellants who at the opening of the fifteenth century followed Saint Vincent

[10] Hollister, Jhon Norman (1979). *The Shi'a of India*. New Delhi: Oriental Books. page 56

> Ferrer on his journey to preach the need of repentance and the coming of the judgement, they were at the very heart of what conscientious churchmen most admired. Flagellation survives in Spain and in many parts of the Hispanic world. It survives, in fact, in the United States in New Mexico, where in spite of a century of horrified disapproval by Protestants and non- Hispanic Catholics, the brotherhood of penitents Commemorate the passion of Jesus by flagellation, the carrying of heavy wooden crosses, and many other forms of discipline, physical and spiritual."[১১]

শুধু শিয়া মুসলমানদের মধ্যে নয় আত্মনিগ্রহের কেন্দ্রিক প্রথা খ্রিষ্টান ধর্ম[১২] এমনকি হিন্দু ধর্মে চরক পূজাতেও[১৩] দেখা যায়। আত্মনিগ্রহ করা কোনো ধর্মের কাছে নতুন কোনো ঘটনা নয়। ৯ মহরমে মুর্শিদাবাদে আগ-কি-মাতমের দ্বারা আত্মনিগ্রহ করেন শিয়ারা। আগুনের মাতম করার ট্রাডিশন মূলত ভারতে শুরু হয় লখনৌ থেকে, মহরমের ৬ তারিখে আগুনের মাতম পালিত হয়ে থাকে। ব্রিটিশদের থেকে পালিয়ে যারা বর্মা থেকে যারা ভারতে এসেছিলেন তারা এই প্রথা চালু করেন (১৯৪২ নাগাদ)। আগুনে হাঁটার প্রথাটি ইরানী প্রথা না হওয়া সত্ত্বেও, এই প্রথার মাধ্যমে শিয়াদের পরিচয় বাহিত হয়।

শিয়া ধর্ম পালনে ৫ টি প্রধান 'ওসুল' বা 'প্রিন্সিপ্যাল' আছে। এই এই পাঁচ উসুলকে 'উসুল-এ-দ্বীন' বলা হয়। সেগুলি হল –

১) তৌহিদ বা আল্লাহের অস্তিত্বে বিশ্বাস;

২) আদল্ বা আল্লাহর গুনাবলী ;

৩) নবুয়ত বা রাসুলে করিমের নবীত্বকে স্বীকার করা ;

---

[11] Roy, Mottahaddeh (1985). *The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in* Iran. New York: Simon and Schuster. p.175

[12] Abbott, Geoffrey. *Flagellation: RELIGIOUS PRACTICE.* https://www.britannica.com/topic/flagellation

[13] চড়ক পূজা বা নীল পূজা হিন্দু ধর্মের বিশেষ একটি লোকজ অনুষ্ঠান। বাংলা বছরের চৈত্র মাসের শেষ দিন এই পুজা পালন করা হয় । সাধারণত দক্ষিন বাংলাদেশে ও পশিমবঙ্গে এই পুজা ভগবান শিবের সম্মানে করা হয়। পৃথিবীকে হলাহলের বিষমুক্ত করতে সেই গরল ভগবান শিব নিজের মধ্যে ধারণ করেন। সেই ঘটনাকে মনে রেখে শিব ভক্তরা নিলের পুজা করে। শিব হলাহলের বিষ পান করে যে যন্ত্রণা ভোগ করে তার সন্তানদের রক্ষা করেছিলেন। এখন নিজের শরীরে নানা ভাবে আত্মনিগ্রহ করে সেই ঘটনা কে মনে করেন শিবপ্রেমীরা। দ্র: https://www.slickpic.com/blog/photographing-gajan-religious-hindu-festival-rural-bengal-night-low-ambient-light-relevant-techniques/

৪) ইমামেত অর্থাৎ রাসুলের পরে ১২জন নিষ্কলুষ ইমামের অস্তিত্বকে স্বীকার করা, রাসুলের পর হজরতে আলির[14] পর ইমাম মেহেদি অবধি তারাই রাসুলের নিশ্চিত উত্তরাধিকারী। আর শেষ ইমাম মেহেদি যিনি পৃথিবীতে পর্দা নিয়ে আছেন। শেষ ইমাম মেহেদি পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ব তিনি ইমামতি করতে ফিরে আসবেন। তাদের ব্যবহৃত বাক্যাবলী আল্লাহের বাণী ও আদেশ হিসাবে গ্রহণ করার নাম ইমামেত;

৫) কায়ামাত বা সকলের পুনরুত্থান ও বিচারের দিন।

এছাড়াও মনে রাখা জরুরি, ৫ উসুল ছাড়া ১০টি কর্তব্যকে আবশ্যিক বলে মনে করেন যা শিয়াদের পালন করতে হয়। এই কারনে যে কোনো প্রকার মজলিশে নহা বা মার্সিয়া যতই পাঠ করা হোক তার পূর্বে বারংবার ৫ উসুল ও ১০টি কর্তব্যকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়। ১০ কর্তব্যগুলি হল –

১) দিনে ৫ বার নামায;

২) রোজা (আরবি রমজান মাসে উপোস বা সীয়াম পালন করা) ;

৩) সুস্বাস্থ্যের অধিকারি এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো হলে হজ্ব বা মক্কায় তীর্থগমন করতে হবে।

৪) জাকাত আর খুমস্ এই দুই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যারা সক্ষম তারা দান করবেন। সম্পত্তি থেকে ও স্বীয় আয়ের লভ্যাংশ অসহায়দের দান করতে হবে।

৫) জিহাদ অর্থাৎ সত্যের জন্যে লড়াই;

৬) আমর্-বিন-মারুফ- অন্যদের ভালো কাজ করার জন্যে উৎসাহ প্রদান করা;

৭) নাহিয়ান-আল-মুনকার অর্থাৎ খারাপ কাজ করা থেকে অন্যকে বিরত রাখা;

৮) তাওয়াল্লা বা রাসুলের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা;

৯) তাবারাহ অর্থাৎ রাসুলের পরিবারের শত্রুদের নিজের বলে মনে করা ও নিন্দা করা।

এই মৌলিক কর্তব্য গুলি পালন করার পর যদি ব্যক্তি কারাবালার শহীদদের মনে করে বিলাপ করতে চায়, সে করতে পারে। কারণ ইসলামের আদর্শ বাঁচাতে হোসেন ও তাঁর পরিবার সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। সেই কারণে মৌলিক কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে হোসেন ও রাসুলের আদর্শ বাঁচিয়ে রাখা প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত

[14] বারো জন ইমামেরা হলেন হজরতে আলি (৬৩৩-৬৬১ খ্রিঃ), ইমাম হাসান (৬৬৪-৬৭২খ্রিঃ), ইমাম হোসেন (৬৭২-৬৮৩ খ্রিঃ), জয়নুল আবেদীন(৬৮৩-৭১২ খ্রিঃ) , মুহম্মদ বাকির (৭১২-৭৩১ খ্রিঃ) , জাফর-আস-সাদিক (৭৩১-৭৩৫ খ্রিঃ), মুসা-আল-কাজিম (৭৫৪-৭৯৯ খ্রিঃ), আলি রেজা (৭৯৯-৮১৭ খ্রিঃ), আল-তাক্কি (৮১৮-৮৩৫ খ্রিঃ), আল-হাদি (৮৩৫-৮৬৮ খ্রিঃ), আল-আসকারী (৮৬৮-৮৭৪ খ্রিঃ), ইমাম মেহাদি তিনি পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বে ইমামতি করবেন বলে ইসলাম অনুগামীরা মনে করেন।

বলে কোনও কোনও শিয়া পন্ডিতরা মনে করেন। আলোচিত কর্তব্য গুলি যারা পালন করবে তারা শিয়া আইডিওলজি এর পরিপন্থি হতে পারবে, অর্থাৎ শিয়া আইডেন্টিটির জন্যে পূর্বে উল্লিখিত ৫ উসুল ও ১০ কর্তব্য পালন করাই যথেষ্ট। শিয়াদের পরিচয়মাপক হিসাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিলাপ না করলেও চলবে। বিলাপ করা প্রাথমিক ভাবে রাসুলের অর্জিত ইসলামের গৌরব যা হোসেন শেষ রক্ত বিন্দু ঝরিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, তা বারবার মনে করা হয় মজলিশে পাঠ করা বিলাপের মধ্যে দিয়ে । উনিশ শতকের জিহাদের উপর রচিত একটি বিখ্যাত কবিতা উল্লেখ করা যায় –

"...নামাজ এহ্লে ইয়াকিন কি জিহাদ-এ আকবর হে

ওয়াযু কে ওয়াক্ত চাড়হাতে হে আস্তিনো কো"[15]

এখানে বলা হয়েছে নামাজ সবচেয়ে বড় জিহাদ, যেখানে নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ করতে হয়, মানব মন একাধিক ভাবনা চিন্তার দিকে প্রতিনিয়ত ধাবিত হচ্ছে। সেই টুকরো টুকরো ভাবনাকে গুটিয়ে নিয়ে এসে কায়মনোবাক্যে আল্লহর ইবাদাতে মনোনিবেশ করার সফলতার নাম নামাজ। সমস্ত ভাবনার উর্দ্ধে আল্লহকে স্বীকার্য দেবার তাগিদই জিহাদ। তাই নামাজ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিহাদ, নামাজের মধ্যে দিয়ে আল্লহকে পূর্ণ রুপে সেবা করা যায়। আর নামজ পাঠের পূর্বে ওয়াযু (হাত, মুখ, পা ধৌত করা) করা হয়। নামাজের পূর্ব প্রস্তুতি হল ওয়াযু। নিজের মন শান্ত করে, মনের কালিমাকে দূর করে নামাজে মনোনিবেশ করা হয়। শিয়া পন্ডিতরা মনে করছেন ওয়াযু যদি কারবালার যুদ্ধের প্রস্তুতি হয় তবে নামাজ সেই কারবালার জিহাদ। সুন্নি হোক কিংবা শিয়া- উভয় মতবাদে নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। বিলাপ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের চেয়ে নামজের মধ্যে দিয়ে ইসলামকে বোঝা ও হোসেনের ত্যাগকে সম্মান জানানো সবচেয়ে উওম। একজন শিয়া হয়ে তার সবচেয়ে বড় কর্ম এটাই, ইসলামিক ভাবাদর্শ রক্ষা করা। যে ভাবাদর্শ বা রাসুলের নির্দেশিত পথ রক্ষা করার জন্যে গোটা আহ্লে বায়াত (রাসুলের গোটা পরিবার) এজিদ রচিত চূড়ান্ত ভোগের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং পৌত্তলিক এজিদের সামনে মাথা নত না করে মৃত্যু বরণ করে জয়লাভ করেছিলেন, ইসলামকে রক্ষা করার আদর্শকে(৫ উসুল ১০ কর্তব্য) পাশে রেখে কেউ যদি বুক চাপড়ায় তবে হোসেনের ত্যাগকে পূর্ণ সম্মান জানানো হচ্ছেনা। হোসেন যে ভাবাদর্শের ধ্বজাধারী ছিলেন তা রক্ষা করা শিয়াপন্থি তথা মুসলিমদের প্রাইমারি বিষয়, কারবালাকে স্মরণ করে বিলাপ করা সেকেণ্ডারি বিষয়।

---

[১৫] Hyder, Sayed Akbar (2005) . *Reliving Karbala*. New York: Oxford University. P:53

তাবারুক ও হাজরি

মহরমের সময়ে সকলের মধ্যে বন্টিত খাবারকেই তাবারুক বা হাজরি বলে। মুর্শিদাবাদে মহরমের সময়ে খাবার বিতরণ করা অনেক ভাবে হয়ে থাকে। খাবার বিতরণ ও সকলে একসঙ্গে খাওয়ার ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে বিশ্বভাতৃত্ববোধকে ছড়িয়ে দিতে চায় শিয়ারা। তবে এখানে উল্লেখ্য সময় এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বদল ঘটে যাওয়ার কারণে মহরম পালনে অনেক বদল এসেছে। তাবারুক হল মহরম মাসের প্রথম দিন থেকে দশ তারিখ বা আসুরা অবধি ইমামবাড়ি গুলিতে প্রচুর পরিমানে খাবারের আয়োজন করা হয়। সেখান থেকে খাবার গুলি সকল পরিবারের মধ্যে বন্টিত হয়, এছাড়াও ভুখা মানুষ গুলিকে এই ১০ দিন আলাদা ভাবে সেবা প্রদান করা হয়। স্থানে স্থানে জল- শরবতের ব্যবস্থা থাকে। জলদান করাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কারণ কারবালার শহীদদের একাধিক অত্যাচারের মধ্যে জল পান করতে না দেওয়া নিষ্ঠুরতম আচরণের দৃষ্টান্ত ছিল। দশ দিন ধরে কোনো শিয়া পরিবারে উনুন জ্বালানো হয়না, এর কারণ ইমামবাড়িতে তৈরি খাবার গুলি সকলের উদ্দেশ্যে বানানো হয়। এই সময় সকলে নানা ভাবে মূলত শোক পালনেই ব্যস্ত থাকে। তারই মধ্যে এই খাবার জাতি ধর্ম নির্বিশেষের মধ্যে বণ্টন করা হয়ে থাকে।

হাজরি

মহরমে ইমামবাড়ি গুলিতে উচ্চস্বরে মাতম পালন করেন মূলত পুরুষেরা, নারীরা ঘরে বসে কিংবা মজলিশে অংশ গ্রহণ করে নহা, মার্সিয়া ও সোজের মধ্যে দিয়ে তারা হোসেন ও তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। নারীদের সর্বসমক্ষে মাতম না করার কারণ প্রথমত ইসলামে নারীকে পর্দা করতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয়ত কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে নারীরা প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ নেয়নি। মাতম ঘরেও পালন করা যায় , কিন্তু পথে পথে হেঁটে হোসেন ও রাসুলের ত্যাগের কাহিনি সকলের মধ্যে পৌঁছে দেবার একটি প্রয়াস করেন পুরুষেরা, তাদের সঙ্গে পিছন সারিতে থকেন নারীরা। আলম হাতে নিয়ে নহা পাঠের মধ্যে দিয়ে কারবালার দিনটিকে সঙ্গে রেখে ইসলামের দ্বীনকে তুলে ধরেন তারা। পথে পথে মাতম গাওয়ার পর সকলে নিজেরদের আযাখানা বা ইমাম্বাড়িতে উপস্থিত হয়। পথে পথে মাতম করার আরেকটি কারণ হল, ইমাম হোসেনের মৃত্যুর পর তার পরিবারকে রক্ষা করার মত কোনও পুরুষ আর বাকি রইলনা। তখন যারা হোসেনের পরিবা্রের অন্তর্ভুক্ত

ছিলেন তাদের হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে কুফার পথে চাবুকের প্রহার করতে করতে এজিদের দরবারে নিয়ে যান, বন্দীদশায় থাকা হোসেনের আপনজনের মধ্যে যে মাতমের পরিবেশ ছিল, তাকে স্মরণ করে বর্তমানে শিয়ারা পথে বের হন, আর সেই দিনের বিবৃতিকে তুলে ধরেন। এই ক্রিয়া-কলাপের পর যখন ফিরে আসেন, তখন মহিলারা একাধিক খাবারে সজ্জিত থাল গুলি প্রসাদাকারে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেন। এই পদ্ধতিতে খাবার দেওয়া হলে তাকে **হাজরি** বলা হয়।

আবার শিশুরা **ফকির** (faqir) সেজে সকলের মধ্যে মিষ্টিজাতীয় খাবার বিলি করে থাকে। ফকির বেশে খাদ্য বন্টন করার তাৎপর্য হল রাসুল মহম্মদ গোটা জীবন দারিদ্রতাকে বেছে নিয়েছেন বাদশা হওয়া সত্ত্বেও, এবং এর মধ্যে থেকে তিনি ইসলামের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। দারিদ্রতা থেকে সৎ থাকার শিক্ষা একটি শিশুকে মহরমে ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে শেখানো হয়। তাকে বোঝানো হয় দারিদ্রতা মানে দুর্ভাগ্য নয়, নিঃস্ব হয়েও যে ভাতৃত্বতা রক্ষা করা সম্ভব তা ফকির সাজা শিশু গুলি খাবার ভাগ করে দেওয়ার মধ্যে বুঝতে শেখে।

খাবার বন্টন করার রেওয়াজকে সুন্নিরা বা অনেক শিয়া মুসলিমরা সমালোচনা করেন। কারণ মহরমের মাসে জল, খাদ্যের অভাবে হোসেন পরিবারের সকলকে যে ভোগ হয়েছিল, সেই ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে এলাহিভাবে খাবার আয়োজন ঠিক নয়। সেক্ষেত্রে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো যায় যে এই সময়ে মজলিশগুলিতে সবধরণের লোকজনের সমন্বয় ঘটে। একটি অনুষ্ঠানে সকল মানুষ মিলেমিশে এক হয়ে যায়। ভুখা মানুষ গুলি এই দিনগুলিতে পেটের দায় নিয়ে ভাবতে হয়না। ইমাম হোসেনের জামানায় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইমানযুক্ত ও সৎ মানুষেরা ভুখা থাকবে না। সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে করে খাবার বণ্টনের প্রথাটি উপস্থাপিত করা হয়।

মুর্শিদাবাদে শিয়া সংস্কৃতি প্রতক্ষ্য করে ও তাদের দেওয়া তথ্য অনুসারে বলা যায় মুর্শিদাবাদী শিয়া সংস্কৃতি বহু পুরোনো । হায়দ্রাবাদ, আওয়াধ থেকে যখন শিয়ারা বাংলায় আসতে থাকে তখন এখানেও সেই সংস্কৃতির বিনিময় ঘটে। কারবালা কেন্দ্রিক নানা সাহিত্য সংরূপ গড়ে উঠলেও মার্সিয়া, কাসিদে, সোজের মত সংরূপ গুলি যে ভাবে ব্যাপকতা পেয়েছে, নহা সেই ভাবে ব্যাপকতা পায়নি। নহা'কে একজন পাঠক সে ঐতিহাসিক টেক্সট হিসাবে নিতে পারে কারণ, মূল ঘটনাকে বিকৃত করে কোনও কবির রচনাকে শিয়া পাঠকেরা তাদের মাতমের অংশ বলে ধরেন না। নহা বা মার্সিয়ার মত কবিতা গুলির প্রাথমিক শর্ত হল চরিত্র

ও ইতিহাস অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ হোসেন কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু হোসেনপ্রেমীর আবেগ, হোসেনকে চোখের জল ফেলে স্মরণ করা তাদের কাছে মূল, সাহিত্য সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও হোসেন প্রেমের ঊর্ধ্বে নয়। নহা শোক প্রকাশ করার মাধ্যম মাত্র। আর মুর্শিদাবাদী নবাবী ও কুরবাতি ইরানীদের বর্তমানে কোনও আলাদা সংস্কৃতি নেই। মুর্শিদাবাদে দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা সংস্কৃতিকে উভয় শিয়া গোষ্ঠী মেনে চলেন।

নবাবী সংস্কৃতি এবং কুরবাতি ইরানীদের সংস্কৃতি বর্তমানে আলাদা করার উপায় নেই, বলাবাহুল্য পার্থক্য খুঁজতে যাওয়াও বৃথা। কারণ শিয়া গোষ্ঠিদের মধ্যে ইমাম হোসেন আদর্শ এমন ভাবে প্রোথিত যে তারা একসঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতিকে আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে একতা বজায় রাখাকে শ্রেয় মনে করেন। তাদের সংস্কৃতি যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে নহা'র কবিতাগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। কুরবাতিদের মধ্যে মুর্শিদাবাদে বসতি স্থাপনের পূর্বে বিশেষ কোনো রচনাধারার পরিচয় পাওয়া যায়না, নবাবীদের সান্নিধ্যে এসে তাদের মধ্যে মহরমের নানা লোকজ অনুষ্ঠানের পদ্ধতিগুলি কুরবাতিরা নিজেদের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। মহরমের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বলা চলে দুই জনজাতি মেলবন্ধন হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

মুর্শিদাবাদী শিয়া সম্প্রদায় ও মহরমের আচার অনুষ্ঠান

ভূমিকা

মুর্শিদাবাদে যাদের মধ্যে নহা সংস্কৃতির প্রচলন আছে তারা হল, নবাবী ইরানী ও কুরবাতি ইরানী। এরা কেউই ভারতীয় নয়, মুর্শিদাবাদে নবাবী আমলে বাংলার নবাব পরিবার ছাড়াও আরও ইরানীদের বসতি গড়ে উঠেছিল। সেই কারণে মুর্শিদাবাদে ইরানী সংস্কৃতির পত্তনের দিকটি এই অংশে আলোচিত হয়েছে। যাদের নবাবী বলা হয় তারা সকলেই সায়েদ বা মির্জা পদবী ধারণ করেন, অর্থাৎ মীরজাফরের উত্তরসূরী। তবে মীরজাফরের বংশধর ছাড়াও আরও একটি প্রভাবশালী 'মীর্জা' বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তারা বাংলার নবাব বংশীয় নয়, তারা মোঘল শাসনে উচ্চপদে ছিলেন, সেই সূত্রে উপাধি হিসাবে সম্রাটের তরফ থেকে 'মীর্জা' উপাধি লাভ করেছিলেন। তারা নবাব বংশীয় না হলেও তারা মুর্শিদাবাদে বনেদী পরিবার হিসাবে পরিগণিত হন, এই পরিবারগুলিও শিয়া মতধারায় বিশ্বাসী। নবাবীদের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কোনো প্রকার তফাৎ নেই। এছাড়া কুরবাতি ইরানী বা জিপসীয় নোমাদ জনজাতির বসতি এখানে গড়ে উঠেছে, মুর্শিদাবাদে বাসবাসের পূর্ব থেকেই তারা শিয়া আদর্শে বিশ্বাসী ছিল কিনা তার যথাযথ তথ্য পাওয়া যায়না, তবে যাযাবরীয় জীবনাযাত্রা করে তাদের মধ্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ কতটা কাজ করত তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ধর্মীয় পরিচয় মুসলিম হলেও শিয়াদর্শনে প্রথম থেকে বিশ্বাসী তা বলা যেতে পারে, কারণ তারা মহরমের সময়েই মুর্শিদাবাদে আসতেন, আবার চলেও যেতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ী ভাবে থেকে যায়, এবং সময়ের সঙ্গে বহু নোমাদীয়দের আগমন হতে থাকে, যারা জিপসীয় ইরানী বা কুরবাতি ইরানী নামে পরিচিত। ধর্মীয় দর্শন এক হওয়ার কারণে নবাবী পরিবার ও কুরবাতি ইরানীদের মধ্যে সংস্কৃতিক বিনিময় ঘটেছে। মুর্শিদাবাদে এই দুই জনজাতির ইতিহাসের দিকটি পর্যালোচনা করা হল।

ইরানে শিয়া অভ্যুত্থানের আগে ইসলামে মহরম-এর কোনো অস্তিত্ব ছিলনা। মহরম আরবি বর্ষের প্রথম মাস। মহরম মাসের ১০ তারিখ ইরাকের কুফায় ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলিফা (দামেস্কের রাজপুত্র, বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী)[১৬] এজিদের ষড়যন্ত্রে নিহত হন হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র ও হজরত আলির কনিষ্ঠ পুত্র

[16] সেই সময় দামস্কের অধিপতি ছিলেন মুয়াবিয়া, মুয়াবিয়ার পুত্র-ই এজিদ। মুয়াবিয়ার মারা যাবার পর এজিদ মুয়াবিয়ার স্থান নিয়েছিলেন।

হজরত ইমাম হোসেন ও তার অনুসারীরা। রাজনৈতিক কারণে নিহত হলেও তাঁর হত্যাকাণ্ডকে ধর্মীয় ভাবাবেগে রঞ্জিত করে দিয়েছিলেন আলির অনুগামীরা। কারবালার তাঁর সমাধিস্থান[১৭] পরবর্তিতে হয়ে ওঠে শিয়াদের প্রধান তীর্থকেন্দ্র।

বছরের সবসময়ই সেখানে দর্শনার্থীদের ভিড় থাকলেও মহরমের ১০ তারিখ তীর্থের উদ্দেশ্যে ইসলামাবম্বীরা যান। আত্মবলীদানের প্রতীক হিসাবে এই দিনটি পালন করেন শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমরা। মহরমের ১০ তারিখকে স্মরণে রেখে ব্যাপক আকারে মহরম পালিত হয় ইরান, সিরিয়া ও ইরাকে। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশে শিয়াপন্থিরা সংখ্যায় নগন্য হলেও সাড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। বাংলার মুর্শিদাবাদে কিছু কিছু স্থানে শিয়াপন্থিরা আছেন, যেমন – ভারতপুর, সালার, জঙ্গীপুর ও লালবাগ অঞ্চলে। শিয়াপ্রভাব এই সকল স্থানে লক্ষ্যনীয় হলেও লালবাগে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে লালবাগের হাজারদুয়ারি এলাকায় সকল মুসলমানই প্রায় শিয়াপন্থি, এ কারণে এই এলাকায় আনুষ্ঠানিক ভাবে মহরম পালিত হয়, তবে হাজারদুয়ারীর মহরম পালন সবচেয়ে খুব বিখ্যাত। বর্তমানে মহরমের অনুষ্ঠানে স্থানীয় সুন্নি মুসলিমরা সহ স্থানীয় হিন্দুরাও সামিল হন। এই অনুষ্ঠানটি প্রকৃত অর্থে ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশ অনুসারে নয়, এটি আসলে লোকজ অনুষ্ঠান। ইরানীয় লোকবিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে মহরম। অনেকের ধারণা মেসোপটেমিয়াদের পূজার আচার আচরণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই লোকবিশ্বাস জাত শিয়া কিংবদন্তী।

মহরম দু'ভাবে পালিত হয়। রোজা করা, কারবালার শহীদদের নামে দান করার মধ্যে দিয়ে পূণ্যকর্মে নিয়োজিত হন। দুইমাস আট দিন ধরে শোক পালন করা শিয়াপন্থিরা আবশ্যিক মনে করেন। ইসলাম নির্দেশিত না হলেও মহরম মাসের শোক পালন করা শিয়াপন্থিদের কাছে বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কারবালার কাহিনির সঙ্গে ধর্মীয়ভাব সংযুক্ত থাকলেও হোসেন প্রেমের আবেগের গভীরতা এতটাই ছিল, তা কালকে অতিক্রম করেছে। এছাড়া সমকালেও যেন এই ঘটনার প্রভাবের মাত্রা কোনো অংশে না কমে তার জন্যে যুগে যুগে কবি ও লেখকেরা তাদের লেখনী পেশন করে চলেছেন। তাদের লেখনীশক্তি অনেকাংশে ইরানীয় লোকজ অনুষ্ঠানকে সর্বব্যাপীত্ব লাভ করানোর ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করেছে।

---

[17] ইরাকের কারবালাতে হোসেনকে সমাধিস্থ করা হয়। সেখানে পরে মাক্কাম-আল-ইমাম-আল-হোসেন নামে মসজিদ ও করা হয়। কারবালার আর'বাইন অনুষ্ঠানটিতে ইমাম হোসেনের দরগাতে বহু মানুষের সমাগম হয়।

মহরম কেন্দ্রিক ইসলামী সাহিত্যধারা ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে লখনৌ, হায়াদ্রাবাদ, দিল্লি, মুর্শিদাবাদের মত শহরে। উল্লেখ্য প্রতিটি যায়গায় একসময় ইসলামী শাসনকালের রাজধানী ছিল। ইসলামি শাসন ভারতবর্ষে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করলে শাসকেরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ভারতবর্ষে প্রোথিত করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন। ইসলামী স্থাপত্য, রন্ধন শিল্প, চিত্র শিল্প, সাহিত্য ধারা সব কিছুর মধ্যেই ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব খুব স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান। শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় সৃজনশিল্প এবং উদ্ভাবনীশক্তি প্রকাশের পথ সৃজনশীল ব্যক্তিদের জন্যে সহজ হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের জন্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইসলামি সাহিত্য খুব সমৃদ্ধ হয়। লখনৌ এর মার্সিয়া সাহিত্য শিল্প বিশ্বের দরবারে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। লক্ষ্যনীয় মুর্শিদাবাদের স্থানীয় শিয়াপন্থি তারা লখনৌ-ই কবি আনিস ও দাবির[১৮] ইকবালের মত বিশ্ববিখ্যাত কবিদের মার্সিয়া ও নহা পাঠ করে মহরমের সময়ের বিলাপানুষ্ঠানকে সম্পন্ন করে। অর্থাৎ তারা আজও সমকালীন। মুর্শিদাবাদে নবাবি আমল শুরু হওয়ার প্রারম্ভে নিশ্চিত ভাবে মার্সিয়া সংস্কৃতি ছিল, কিন্তু সেই সময়ের মার্সিয়া গুলোর খুব সম্ভবত পুস্তককারে প্রকাশিত হয়নি, হাজারদুয়ারীর গ্রন্থালয়ে পুরানো পুঁথিগুলি কিছু সংরক্ষিত আছে, নবাবী বর্তমান উত্তরসূরীরা কেউ কেউ স্মৃতির মধ্যে পুরোনো কিছু কিছু নহা ধরে রেখেছেন।

মুর্শিদাবাদে মার্সিয়া কবিদের কবিতা গুলো তাদের সমকালে প্রসিদ্ধি পেলেও সংরক্ষিত হয়নি। এই সময়ে যারা মার্সিয়া বা নহা লিখছেন তারা কিছুটা হলেও সচেতন। উর্দুভাষী নবাবী সংস্কৃতিতে উর্দুভাষাতে মার্সিয়া সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছে। তবে ভারতপুর, সালার, জঙ্গিপুরের বাংলাভাষী শিয়াপন্থিদের মধ্যে বাংলায় মার্সিয়া সংস্কৃতি গড়ে না উঠলেও অনুদিত নহা পাঠের প্রচলন আছে।

মুর্শিদাবাদী শিয়াপন্থিদের মহরম পালন

মুর্শিদাবাদের মুসলিম শিয়া সম্প্রদায়ের অভূত্থান সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপিত হলে, বাংলায় মুসলিমদের আগমন ও শিয়া দর্শন সম্পর্কে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে শিয়া দর্শনের যোগ কোথায় এবং কি ভাবে মুর্শিদাবাদের বুকে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমরা শিয়া হিসাবে নিজেদের আলাদা সত্তা তৈরি করেছে সেই প্রশ্ন উঠেই আসে। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের পত্তন ও গঠন কোনো আকস্মিক

[18] সাফাভিদ রাজবংশে নবাব বুরহান-উল-মুল্‌কের সময়ে (১৭২২-১৭৩৯) মার্সিয়া বা নহা কেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রসার ঘটে।

ঘটনা নয়, ১২০৩ খিষ্টাব্দে ইখতিয়ার-উদ্দিন-মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি-র বাংলা বিজয় থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খিষ্টাব্দে সিরাজ-উদ-দৌল্লার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশো বছরের এই দীর্ঘ সময় কালে বাংলায় মুসলমান সমাজের পত্তন গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। বাংলায় মুসলিম ভাবধারার বিস্তার ঘটে ইখতিয়ার উদ্দিনে হাত ধরে। এই সময়ের মধ্যে মুসলমানরা সুলতান-সুবেদার-নবাব-নাজিম পদে বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। স্বাধীন সুলতান আমলেই সমগ্র বাংলাদেশের নাম হয়েছিল বাঙলা। বাংলায় রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রকৃতিগত সময়সীমা বিভাজন করা হয়েছে এইভাবে – ১২০৪-১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ ও ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ (স্বাধীন রাজ্য) ; ১৫৩৮-১৫৭৬ (আফগান কর্তৃত্ব) ; ১৫৭৬-১৭১৬ (মুঘল সুবা) ; ১৭১৭-১৭৬৫ (স্বাধীন নবাব) । এর পরেই 'Islam as a political force was supplanted by the rule of the British in Bengal'[১৯]

বর্তমানে মুর্শিদাবাদে শিয়া প্রভাব দেখা যায় লালবাগ, ভরতপুর, সালার, জঙ্গীপুর বিভিন্ন স্থানে। আমাদের দেশে সুলতানি ও মোঘল আমলেই ইরানীরা ছড়িয়ে পড়ে। মহরমের সময়ে ইরানী শিয়া প্রভাব খুব ভালো ভাবে বোঝা যায় হাজারদুয়ারী এলাকায়। মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলি খানের[২০] (১৭১৭-১৭৫৬) সময় থেকেই ইরানী শিয়া প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদের যে তিন রাজবংশ মূলত রাজত্ব করেছে– নাসিরি, আফসার এবং নাজাফি রাজবংশ, এই তিন বংশই শিয়াদর্শনে বিশ্বাসী ছিলো। মুর্শিদাবাদের রাঢ় এলাকায় বহিরাগত মুসলমানের বসতিস্থাপন হয় তুর্কি পাঠান মোগল আমল থেকেই। তবে মুর্শিদকুলির সময় থেকেই পারস্য থেকে বহু পরিবার মুর্শিদাবাদে পাকাপাকি ভাবে বসতি স্থাপন করে। মুর্শিদকুলি খান একজন ইরানীর সহচর্যে বড় হওয়ার কারণে, ইরানীদের প্রতি তার আলাদা সহানুভুতির যায়গা ছিল। বলা বাহুল্য মুর্শিদকুলির পালিত পিতা

---

[19] Islam in Bengal, Sarkar, Jagadish Narayan (1972) Calcutta: Ratna Prakashan

[20] নবাব মুর্শিদকুলি খান অধিক পরিচিত বাঙলার সুবাদার জাফর খান নামে। তিনি আদিতে একজন ব্রাহ্মন পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। খুব সম্ভবত ওরিষ্যা বা দাক্ষিনাত্যের দিকে। তার বাল্যকালে শফি ইস্পাহানি নামক এক উঁচু স্তরের ইরানী কর্মকর্তা তাকে ক্রীতদাস হিসাবে ক্রয় করেন এবং পরে মোহাম্মদ হাদি নামকরণ করে তাকে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করেন ও যথার্থ শিক্ষাদান করেন। খুব সম্ভবত ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে হাদিকে নিয়ে তিনি নিজ দেশ ইরানে চলে যান। পিতৃসম শফির মৃত্যু হলে হাদি ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ফিরে আসেন এবং বেরার প্রদেশে দিওয়ান আব্দুল্লাহ খোরাসানির অধীনে চাকরী নেন। এরপরে ক্রমশ তার পদোন্নতি ঘটতে থাকে ও পরে তিনি মনসবদার পদে উন্নীত হন। এই সময়ে তিনি কারতলব খান উপাধি লাভ করেন। কর্তব্য ও কাজের প্রতি নিষ্ঠা , সততা, ন্যায়পরায়ণতা, অসাধারণ প্রতিভা ইত্যাদি কারণে তিনি প্রথমে বাঙলা সুবার দিওয়ান ও পরে সুবেদার পদে নিযুক্ত হন সম্রাট কর্তৃক। তিনি মুর্শিদকুলি খান ও পরে জাফর খান উপাধি লাভ করেন। সম্রাট ওরঙ্গজেব তাকে তার নিজ পৌত্র আজিম-উস-শানের চেয়ে অধিক বিশ্বাস করতেন- *সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন,* সৈয়দ গোলাম খান তাবাতাবায়ি,পৃষ্ঠা-৭

খোরাসানের[২১] আফসার তুর্কিদের গোষ্ঠীভুক্ত এবং ঐ সেখানের প্রসিদ্ধ ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, শুধু তাই নয় তাঁরই সময়কালে মধ্য এশিয়া ও বাগদাদ থেকে বহু সুফিসাধকরা ধর্ম প্রচারের জন্যেও আসে বঙ্গদেশে। এর পরে আফসার[২২] বংশোদ্ভূত আলিবর্দী খানের সময় কালেও মহরম পালনের ঐতিয্য বহাল ছিল।

আলিবর্দীর উত্তরসূরী সিরাজ-উদ-দৌল্লা ইমামবাড়ি তৈরি করেন মহরম পালনের উদ্দেশ্যে। এই স্থাপত্যগুলির থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না নবাবী সময় থেকে মহরম পালনের গুরুত্ব কতখানি ছিল। ইমামবাড়ার মাঝখানে আছে মদিনা। কথিত আছে ৬ ফুট গর্ত করে এই মদিনা তে মক্কার মাটি এনে তা ভরাট করা হয়েছিল। হজ্বের সময় অর্থাৎ আরবি জিলহজ্ব মাসে অনেকেই ইমামবাড়ির কাল্পনিক মদিনা দর্শনে আসতেন বহু দর্শনার্থী যাঁদের পক্ষে আরবে হজ্বে যাওয়ার সামর্থ্য ছিলনা। মুর্শিদাবাদের মদিনাতে হজ্বে আসার রীতি বর্তমানে প্রচলিত নেই কিন্তু মদিনা নামক যায়গাটি নবাবী আমলের ইতিহাসকে সাক্ষী দিচ্ছে। নবাবী সময় থেকেই ইমামবাড়ি ছিল মহরম পালনের মূল কেন্দ্রস্থল। আরবী বছরের মহরম মাসের প্রথম দশদিন খুব জৌলুসের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে মহরমের শোকানুষ্ঠান। তাজিয়া, মিম্বার, ঝুলা, আলম এসবই কারবালার যুদ্ধের এক একটি প্রতীক। ইমামবাড়িতে ও হাজারদুয়ারীর মিউজিয়ামটিতে কারবালার চিহ্নবাহক বস্তুগুলি সরকারীভাবে সংরক্ষিত। মার্সিয়া বা নহা পাঠের মাধ্যমে মাতম[২৩] করে কারবালার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা মহরমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহরমের সময়ে দীর্ঘ দু'মাসের থেকে বেশি সময় ধরে মাতম করার প্রথা

---

[21] খোরাসান নামে পরিচিত ইরানের পূর্বাঞ্চলে এবং সেই সঙ্গে তাব্রিজ থেকে মেশেদ পর্যন্ত সেই সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে অসংখ্য তুর্কির বসতি ছিল এবং তাদের বেশির ভাগ তাবুতেই বসবাস করতেন। সেনাদলে চাকুরি, মেষপালন, কৃষিকাজ ছাড়া তারা অন্য বিশেষ কোনো কাজ করতেন না। কারণ ইরানের আদিঅধিবাসীরা সেনাবাহিনীর কাজে খুব দক্ষ ছিলেন না এবং তাদেরকে তুচ্ছার্থে 'তাও', 'তাজিক' অথবা 'বুরঘার' (Burghar) বলা হতো। অবশ্য 'ভাতিয়ার' বা 'ভাত্রিয়ান' (Bahtrians) নামে কিছু পরিচিত উপজাতীয় লোক খুব ভালো সৈনিক হতেন। পার্বত্যাঞ্চল অধিবাসী হলেও তারা ভালো অশ্বারোহী ছিলেন। ইতিহাসখ্যাত করিম খান ছিলেন ভাতিয়ারি এবং দুধর্ষ নাদির শাহ ছিলেন আফ্সার। - হোসেন খান তাবাতাবায়ি, সৈয়দ গোলাম, (২০০৫) । *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ পৃষ্ঠা ৭

[22] আলীবর্দী খানের মা ইরানের খোরাসানের এক তুর্কি উপজাতি থেকে এসেছিল, আলিবর্দী খান সেই অর্থে ইরানীয় ছিলেন। যদিও তাঁর পিতা মির্জা মোহম্মদ আরব বংশোদ্ভূত, তিনি মুঘল দরবার থেকে খান উপাধি পেয়েছিলেন। হোসেন খান তাবাতাবায়ি, সৈয়দ গোলাম, (২০০৫)। *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ পৃষ্ঠা ৭

[23] মাতম করার অর্থ হল শোক বা বিলাপ করা।

কারবালার শহিদের প্রতি আনুগত্যকে আরো বেশী করে বাড়িয়ে তোলে। কয়েকশো লোক জোড়ো হয়ে বাতি জালিয়ে অপরূপ দৃশ্য তৈরি করতেন ইমামবাড়িতে নবাবী আমল থেকেই। মুর্শিদাবাদে নবাবী আমল থেকে এখনো অবধি শিয়া সংস্কৃতির অন্যতম মূল অংশ মহরম পালন করা। মুর্শিদাবাদে শিয়া-কালচার কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়।

ভারত ও পাকিস্তানে শিয়াপন্থিরা নগণ্য হলেও সাড়ম্বরে এ-দেশ গুলোতেও মহরম পালিত হয় সুলতানি ও মুঘল আমলে ইরানীদের মাধ্যমে এদেশে ছড়িয়ে পড়ে মহরমের প্রভাব। মুর্শিদাবাদের যে সব প্রান্তে শিয়াপ্রভাব লক্ষণীয় তার মধ্যে বিশেষ করে লালবাগ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মহরম আরবি বর্ষের প্রথম মাস। এই পবিত্র মাসে ৭২ জন শহীদের রক্তে কারবালার মাটি রাঙা হয়ে উঠেছিল । উমাইয়ারা কলেমা পড়ে মুসলিম হলেও তাঁদের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি কখনোই প্রেম জন্মায়নি। মুসলিম নামধারী উমাইয়ারা অন্তরে পৌত্তলিক ছিলেন। ইসলামকে জীবিত রাখার দায়িত্ব যারা নিয়েছিলেন, তাদের হত্যা করে পৌত্তলিকতায় ফিরে গিয়ে স্বৈরচারী শাসন ব্যবস্থা চালু করার দীর্ঘকালীন ষড়যন্ত্র করছিলেন উমাইয়ারা। মুয়াবিয়া, এজিদ, ইবনে সাদ এঁরা প্রত্যেকেই ইসলামের ধ্বজাধারীদের সমূলে নাশ করে জিইয়ে রাখা স্বপ্ন সাধন করেন বটে কিন্তু রাসুলের আদর্শকে নষ্ট করতে পারেননি। ইরাকের কারবালাতে দশ মহরম বা আসুরার দিন থেকে ৪০ দিন পর ইমাম হোসেনে মৃত্যুবার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে (২০ সফর) পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শোকানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২০ সফরের বৃহত্তম জমায়েতকে আর'বাইন বলা হয়। মুসলিমরা মক্কা, মদিনা ছাড়াও ইরাকের নাজাফ,[২৪] কারবালাকে পবিত্র নগরী বলে স্বীকৃতি দেন। শিয়া মুসলিমরা আরবাঈনে গোটা জীবনে একবার শরিক করাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন, সুন্নি মুসলিমরাও আরবাঈনে শরিক হন। কারণ 'পাঞ্জেতান পাক' এর প্রতি সমগ্র মুসলিম বিশ্ব শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করেন। মহরমের শুরুর দিন থেকে সমবেত ভাবে ১০ দিন মজলিশ চলতে থাকে। এরপরেও থেকে দুই মাস আটদিন অবধি শিয়া পরিবার গুলিতে মাতমের পালা চলে। এই অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশিত নয়, এটি একটি লোকজ অনুষ্ঠান।

বর্তমানে যে নবাব বংশীয়রা মুর্শিদাবাদে আছেন তারা বেশীর ভাগই মীরজাফরের উত্তরসূরীরা। মীরজাফরের নবপ্রজন্মের সকলে নামের প্রথমাংশে 'সৈয়দ' ব্যবহার করেন, শেষে 'মির্জা' পদবী ব্যবহার করেন। সাধারণভাবে মীরজাফর সৈয়দ বংশের উওরাধিকারী ছিলেন। মহম্মদের জামাতা আলি ছিলেন

[24] নাজাফ শহরকে পবিত্র নগরী বলা হয়, হজরত মহম্মদের জামাতা হজরত-এ-আলিকে এই নগরে দাফন করা হয়েছিল।

মীরজাফরের ৩০তম পূর্বসূরী (Mirza), সেই কারণে জন্মগত সূত্রে তিনি সৈয়দ পদবী পেয়েছিলেন। এছাড়া এখানে আরেকটি মীর্জা (Meerza) বংশের পরিচয় পাওয়া যায়, এরা দাবি করেন যে তারা মীরজাফরের বংশধর নয়, মুঘল রাজবংশ থেকে এই 'মীর্জা' পদবী তাঁদের পাওয়া। স্বাভাবিক ভাবেই মীর্জা বা মির্জা পদবী অধিকৃত পরিবার গুলি রাজবংশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ থাকার কারণে নিজেদের অভিজাত বলে মনে করেন। শেখ, তারাফদার, চৌধুরি, সৈয়দ ইত্যাদি পদবিগুলি বাঙালি মুসলমান সমাজকে আশরাফ ও আতরাফ[২৫] -এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছিল।

বাংলাদেশে যাঁরা 'সৈয়দ' পদাধিকারী তারা একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত নিজেদের এদেশের জন্মগত বলে মনে করতেন না। এখনো তথাকথিত অনেক 'সৈয়দ' পদবিধারীর মধ্যে এই মানসিকতা কাজ করে যে, তাঁরা অথবা তাঁদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন ইরাক, সৌদিআরব কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ থেকে।

এই জন্যে তাঁরা এদেশের খাঁটি বাঙালি মুসলমান থেকে নিজেরদের অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মনে করেন পৃথক এক ধরনের অহমিকাসর্বস্ব মানসিকতায় ভুগতেন। একটা সময় গেছে, যখন এই তথাকথিত আশরাফ সম্প্রদায় বাঙালি মুসলমাল সমাজে শ্রেণি-বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। এদেশের সাধারণ মুসলমানকে তাঁরা বলতেন 'আতরাফ', যার আভিধানিক অর্থ নিম্ন সমাজ, নিম্নবংশ, নিম্নবর্গের লোক। বাঙালি মুসলমান দুই জাত অর্থাৎ আশরাফ আর আতরাফ বিভক্ত, এটা তথাকথিত অভিজাত শ্রেণি পদবিধারী মুসলমানরাই প্রচার করেছিলেন। অভিজাত পদবি খ্যাত নবাব আব্দুল লতিফ চৌধুরী বলেছিলেন, ছোটলোক বাঙালি মুসলমানের মক্তবে যাওয়ার দরকার নেই। এই তথাকথিত অভিজাত পদবিধারী বাঙালি মুসলমান বাংলা ভাষাকে নিজেরদের ভাষা বলে মনে করতেন না। তাঁরা মনেই করতে চাইতেন না যে তাঁরা এই দেশের মানুষ, এই মাটির মানুষ। তাঁদের মনে ছিল প্রচন্ড অহংবোধ, কারণ তাঁরা এসেছেন ইরান-তুরান আর আরব জাহান থেকে। তাদের পারিবারিক ভাষা ছিল আরবি, উর্দু অথবা ফার্সি।

প্রাচীন বাংলায় হিন্দু সমাজে পুরনো পদবির মধ্যে সেন এবং পালই বিখ্যাত। তবে সচেতনভাবে পদবি ব্যবহারের প্রচলন মধ্যযুগের সূচনা থেকেই এবং ব্রিটিশ শাসনামলে তার ব্যাপক বিকাশ ঘটে। প্রাচীন বাঙালি সমাজে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেনি এবং সপ্তম ও অষ্টম শতকের সময়-সীমায় যখন মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যান্য নব্য

[25] হান্নান, মহম্মদ(১৯৯৫) । *বাঙালি মুসলমানের পদবি*। ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ২০

মুসলিম অঞ্চল থেকে আউলিয়া-দরবেশগণ বাংলাদেশে আসছেন, তখন সদ্য নতুন ধর্ম গ্রহণকারী বাঙালি মুসলিমরা কি ধরনের পদবি ধারন করেছিলেন, সে সম্পর্কে আজ তেমন কিছু জানা যায়না।

মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের যে কয়টি পদবি দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে শাহ, খান, শেখ, সৈয়দ ইত্যাদিই প্রধান। বুঝতে কষ্ট হয়না যে, প্রাচীনযুগে সমাজে যারা মুসালমান হচ্ছিল তাদের কেউ কেউ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত 'শেখ' কিংবা 'শায়খ' অথবা 'সৈয়দ', 'শাহ' ইত্যাদি পদবি দেখাদেখি রেখে গিয়েছিলেন। কারো কারো পদবি এসময় এসেছিল বিবাহ সূত্রেও।

তবে সৈয়দ পদবি এসেছে নবি-নন্দিনী হজরত ফাতিমা ও হজরত আলির বংশধর থেকে। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এই বংশের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র না থাকলেও বাংলাদেশে অনেক মুসলমান পরিবার 'সৈয়দ' পদবি ব্যবহার করে নিজেদের সম্ভ্রান্ত ও কুলীন মুসলমান বলে দাবি করে থাকেন।
বস্তুত বাঙালি মুসলমান সমাজে 'সৈয়দ' নন এবং পারিবারিক কোনো কুলীন পদবীও নেই, অথবা পুর্ব পদবি-ঐতিহ্য পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক এমন অনেক বংশগোষ্ঠী বা ব্যক্তিবিশেষ বাংলাদেশে সৈয়দ পদবি আরোপিতভাবে ব্যবহার শুরু করেছে।

একটা সময় 'মির্জা' পদবি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন উপাধি ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজে। ভারতীয় উপমহাদেশে মোগলদের আগমনের সঙ্গে 'মীরজা' বা 'মির্জা' পদবির ইতিহাস জড়িত। মোগলদের উপাধি ছিল 'মির্জা' এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা ব্যবহার করতেন 'আমীরজাদা'। ড. আহমেদ শরীফ তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে এই পদবির আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেছেন, আমীরজাদা-র সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে 'মীরজা'।[২৬]

তবে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এখন যে নবাব পরিবার বাস করেন তাদের অনেকেই নামের আগে 'সৈয়দ' এবং নারীরা 'সাঈয়েদা' ব্যবহার করেন, আর পদবিতে মীরজা, 'রিজভি,' 'খান' ব্যবহার করেন। সিরাজ-উদ্-দৌলার মৃত্যুর পরেই তার বংশকে ছলের আশ্রয়ে নির্বংশ করা হয়। এখন যারা আছেন তাদের বেশিরভাগই মীরজাফরের বংশধর, তারা মির্জা পদবি গ্রহন করেন। কারণ তাদের পদবি এসেছে আলির বংশধরের সূত্র থেকে। দিল্লিতে ঔরংজেবের সময় হুসেন ইরাক থেকে নাজাফি[২৭] এসেছিলেন । তবে মুর্শিদাবাদের 'মির্জা'

---

[26] শরীফ, আহমেদ (সম্পাদিত) (১৯৯২) । *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমী ।পৃষ্ঠা ৫২৯

[27] তিনি ইরাকের নাজাফ শহরে সমাধিস্থ হজরত আলির দরগার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৬৭৭ সালে ঔরঙ্গজেব মক্কায় হজ্ব করতে গেলে সেখানে হুসেন নাজাফির সঙ্গে পরিচয় হয়। হুসেন নাজাফির আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যক্তিত্ব ঔরঙ্গজেবে মনে ভীষণ ভাবে প্রভাব ফেলে এবং দিল্লিতে নিয়ে আসেন। সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি পদে হুসেন নাজাফিকে নিয়োগ করেন। হুসেন

পদবিধারী মানে এই নয় যে তারা শুধুমাত্র মীরজাফর বংশধর। এখানে আর এক মীরজা পদবিধারীর বাস আছে যারা নিজের মোঘল বলে পরিচয় দেয়। মোঘল আমলে মীরজাদা একটি পদ ছিল, তার সংক্ষিপ্তয়ান হয়ে মির্জা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদী কুরবাতি ইরানীদের পরিচয়

অপরদিকে কুরবাতি ইরানীরা মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন প্রায় ৪০ বছর এর বেশী, এদের পরিচয় প্রসঙ্গে এখানে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে বলা যেতে পারে বর্তমানে তারা পুরোপুরিই নবাবী শিয়াপন্থিদের মতামত বা ধর্ম পালনের পদ্ধতিকে গ্রহন করেছেন। কুরবাতি ইরানীরা শিয়াপন্থি হলেও তারা ইরানীয় নোমাড জাতি, মুর্শিদাবাদে বা ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্বে আলাদা ভাবে ধর্মীয়বিশ্বাসের ভিত্তি কি তাদের কি ছিল বলা কঠিন। নিঃসন্দেহে বলা যায় নবাবী ধর্মপালন সঙ্গে তাদের ধর্মপালনের এখন কোনো তফাত নেই। স্থানীয় শিয়াপন্থিদের ধর্মদর্শনের সঙ্গে নবাবী শিয়াদের কোনো তফাত না থাকলেও ধর্মপালনের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভেদ আছে। এদের অনেকেই মহরমের অনুষ্ঠানে শরিক হন না। জমায়েতের সঙ্গে মাতম পালন বা দশ দিন ব্যাপী যে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পথে পথে মহরম পালনে মহড়া চলে তাতে যেমন অংশ নেন না, তেমনই নিজেকে আঘাত করার মধ্যে দিয়ে যে সমবেত ভাবে মাতম চলে সেই সব ক্ষেত্রেও তারা শরিক হন না। নামাজ, কোরান পাঠ, খাদ্য ও বস্ত্রদান, নিজের বাড়িতে মাতম সভা করে নির্দিষ্ট সময়ে মাতম[২৮] করে থাকেন বেশীর ভাগ স্থানীয় শিয়াপন্থিরা। আবারও উল্লেখ্য তফাৎ ধর্মীয় দর্শনে নয় ধর্মপালনের পন্থায়। নামাজ, রোজা পলনের মত ইসলাম নির্দেশিত ধর্মীয় প্রথা নয় বলেই মহরম পালনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই ।

নাজাফির পুত্র আহমেদ নাজাফির বিবাহ হয় ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারা-র কন্যার সঙ্গে। আহমেদ নাজাফির পুত্র হলেন মির মহম্মদ জাফর আলি খান ওরফে মীরজাফর।

[28] মাতম বা শোক করা নানা পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। নহা ,সোজ, মার্সিয়া মত শোকগাথা পাঠ করে মাতম করা হয়। দলবদ্ধ ভাবে একসঙ্গে বুক চাপড়িয়ে তার সঙ্গে নহা যুক্ত করে সুরের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে মাতম গাওয়া হয়। বুক চাপড়ানো রোদনের সংজ্ঞাবাহক। তাই বিলাপ সুরে বিশেষ করে নহা পাঠ করা হলে বুক চাপড়ানো হয়। সমবেত ভাবে ছন্দ মিলিয়ে বুক চাপড়ানোর শব্দ এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করে। পিঠে ও বুক থেকে নিজে আঘাত করে রক্তপাত করার মধ্যে শহীদদের আত্মবলিদানের প্রতি আনুগত্য লুকিয়ে আছে। এই রীতিকে খুন-এ-মাতম বলা হয়। কুরবাতি ইরানিরা জ্বলন্ত কাঠ-কয়লার মঞ্চ তৈরি করে তার উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে সহ্যসীমার পরিচয় দিয়ে হোসেন আনুগত্যকে প্রকাশ করেন, মাতম করার এই রীতিকে আগ-কা-মাতম বলা হয়। তবে রক্তপাত ঘটিয়ে হোসেন প্রেম দেখানোর পক্ষে সুন্নিরা নন। স্থানীয় শিয়া মুসলিমরা মাতম করেন শোকগাথা পাঠ করে।

হাজারদুয়ারী এলাকায় শেষ চার পাঁচ দশক ধরে কুরবাতি ভাষাভাষী জীপসীয় ইরানীদের বসবাস আছে। মুর্শিদাবাদী কুরবাতি ভাষাভাষি ইরানীদের এ দেশে আগমনের ব্যাপারে কোনো কংক্রিট ধারণা না পাওয়া গেলেও এদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে কিছুটা ইতিহাস জানা করা সম্ভব। 'ঘোরবাত্তি' বা 'কুরবাতি'[২৯] হল ইরান ও আফগানিস্থানের একটি নোমাডিক গোষ্ঠী। ইরানে বহু সংখ্যায় ঘোরবাতিদের বসবাস আছে। ১৯৭৬-১৯৭৭ এর গণনা অনুযায়ী আফগানিস্তানি ঘোরবাতিদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজারের উর্ধ্বে। এরা বাসেরি উপজাতির একটি অংশ, বাসেরিরা পারসীয় উপজাতি যাদের বাস (Pars province[৩০]) ইরানের ফার্স প্রদেশে, মেষ পালন করা এদের প্রধান পেশা। বাসেরীরা ইরানে বসবাস করলেও এদের ভাষা ইরানী নয়। এরা যে ভাষায় কথা বলে তা হল 'ডোমারীর'[৩১] উপভাষা 'কুরবাতি'। বাসেরীয় উপজাতির সঙ্গে ঘোরবাতিদের জীবন-যাত্রায় মিল না থাকলেও তাদের স্বাতন্ত্র্যতা ভাষায় দেখতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদে কুরবাতি ভাষাভাষী যারা আছেন তারা যে এক যায়গা থেকে এসেছেন এমন নয়, কুরবাতি ভাষাভাষী ইরানীয়দের সঙ্গে কথপোকথনের সূত্রে তাদের থেকে একাধিক তথ্য পাওয়া গেছে, যে তথ্যের মধ্যে আপতভাবে অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য দেখা যায়না। একাধিক ইরানীয় পরিবারের দেওয়া তথ্য গুলি একে অপরের সঙ্গে পরস্পর বিরোধী। কিন্তু তারা যে একই স্থান থেকে প্রচরন করে এসেছেন এমন নয়, একাধিক সূত্রে তাদের দেওয়া তথ্য অনুসারে বহু অমিল থাকলেও ভাষা ব্যবহারের দিকটি তাদের স্বতন্ত্রতার দিকটি তুলে ধরে। তারা নিজেদের ইরানী বললেও তারা ইরান থেকেই এসেছে এমন নয়, ইরাক, সিরিয়া অঞ্চল থেকেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে এদের স্থানান্তর ঘটেছে। অবশ্য জাতিগত (ethnonym) যদি নামের কথা বলা হয় ব্যাপক অর্থে 'জিপসী' নামে পরিচিত, স্থানীয় নাম যদিও আলাদা। ডোমারি, ঘোরবাতি, ডোম, নাওয়ার,[৩২] কাওয়ালি– প্রত্যেকটিই হল জিপসী সম্প্রদায়ের স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নাম। জিপসী সম্প্রদায়ের যারা ইরাকে

[29] https://en.wikipedia.org/wiki/Ghorbati

[30] Pars province also known as Fars or Persia in the Greek sources in historical context, is one of the thirty-one provinces of Iran and known as the cultural capital of the country – https://www.scoopwhoop.com/European-Gypsies-Are-Descendants-Of-Indian-Dalits-Who-Migrated-1400-Years-Ago/#.tsl8qifnc

[31] http://www.iranicaonline.org/articles/gypsy-i

[32] https://en.wikipedia.org/wiki/Nawar_(people)

আছে তাদের কাওলিয়া' জট, ঘোরবাতি বলা হয়। তারা বর্তমানে বেশির ভাগই আরবি ভাষী হলেও তাদের জাতিগত (Ethnolect) ভাষা পারসি, কুর্দিশ, তুর্কিশ, আগের প্রজন্মের যারা আছেন তারা এই ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন। নানাভাবে বিনোদন করে এবং ছোটো ব্যাবসা করেই এরা এদের জীবিকা নির্বাহ করে। জিপসী জাতির বৃহত্তর উপজাতিরা হল – বু-বারুদ, বু-সোয়াইলেম্, বু-হেলিও, বু-থানিও, বু-মুরাদ, বু-আক্কার, বু-শাতি, আল-ফারাহিদা, আল-তাইরাত, বু-খুজুম, বু-আব্দ, বু-নাসিফ, বু-দেলি, আল-নাওয়ার। কাওলিয়ারা ভারতবর্ষে এসেছিল প্রায় হাজার বছর আগে।

সাদ্দাম হোসেন এর শাসনের সময়ে অন্যান্য জাতির সঙ্গে তারা মিলমিশে একসঙ্গেই বসবাস করতো। অতি গোঁড়া ইসলাম উত্থানের সময় থেকে ২০০৪ সালের পর তাদের সামাজিক পদস্খালন ঘটতে থাকে। কাওলিয়ারা মুসলিম ধর্মাবলম্বী হলেও ইরাকে তাদের গোড়া ইসলামপন্থিরা কোনো স্বীকৃতি দেয়নি। বাগদাদের দক্ষিন-পশ্চিমে ১০০ মাইল এর মধ্যে কাওলিয়া নামক একটি সাবেকি গ্রামে তাদের বাস ছিল। শিয়া যুদ্ধলিপ্সু মিলিট্যান্ট মক্কতদা-আল-সাদ্‌র[৩৩] এর আদেশে এই গ্রামকে পুরো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তার দৃষ্টিতে জিপসী জাতির মানুষেরা সামাজিক ভাবে অনুন্নত, নৈতিক ভাবে অনেক পিছিয়ে পড়া, অর্থাৎ সভ্য সমাজে তারা একেবারেই বেমানান। এই জন্যেই তাদের গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়ার পর প্রায় এক হাজার গ্রামবাসীকে উচ্ছেদ করা হয়। সিরিয়াতে যে সকল 'ডোমারি' ভাষী জিপসীরা আছে তারা সেখানে ডোম বা নাওয়ার নামে পরিচিত। সিরিয়ার আলেপ্পোতে এই সম্প্রদায় সবচেয়ে বড় সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃত, বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রায় ২৫-৩০ হাজার। তারা সেমি-নোম্যাডিক শ্রেণির। তারা কিছু সংখ্যায় দেশের বাইরেও স্থান পরিবর্তন করে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এরা সমাজে একেবারেই প্রান্তেবাসী মানুষ। তারা একেবারে প্রান্তেবাসী হলেও অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক আদান-প্রদান করে। ভারতীয় জিপসীরা (ডোমারি) বিশ্বাস করে তারা পারসীদের সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিল, বর্তমানে তারা মনে করে, যে তারা ভারতীয় নোম্যাডিক জাতি অংশ, যাদের মুল পেশা ছিল বিনোদন করা, এবং ধাতব কাজ করা। কিন্তু সিরিয়া, ইরাকের উচ্চ বর্ণের শিয়া মুসলিমরা 'নাওয়ার' শব্দটি স্ল্যাং হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। 'নাওয়ার' সম্বন্ধে তাদের ধারণা নাওয়ার মাত্রই ব্যাভচারী জীবন-যাপন পালন করে, যাদের পেশা চুরি করা, ভিক্ষা করা।

[33] https://en.wikipedia.org/wiki/Gypsies_in_Iraq

জিপ্সিদের অরিজিন নিয়ে কোনো একক ধারণা নেই। সেই কারণেই মুর্শিদাবাদে কুরবাতি ইরানীয়দের (জিপসী) সঙ্গে কথা বলার সূত্রে দ্বিমুল ধারণা তৈরি হয়েছে। তারা জানিয়েছে তাদের কেউ-ই এখানের দীর্ঘস্থায়ী অধিবাসী নন। শেষ দুই তিন দশক ধরে তারা মূলত হাজারদুয়ারী এলাকায় স্থায়ী ভাবে থাকার স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এই কয় দশকে তাদের নানা ভাবে বিবর্তন হয়েছে। নোম্যাডিক বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের থেকে অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে এসেছে। বিবর্তিত হয়েছে তাদের ধর্মীয় দর্শন, তাদের সংস্কৃতিতে সংযোজন ঘটেছে মুর্শিদাবাদি নবাবী সংস্কৃতির বেশ নানা দিক। তফাৎ ঘটেছে তাদের জীবনযাত্রার আদলে। কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রেই তারা তাদের নিজস্বতাকে বহাল রেখেছে। কুরাবাতি ইরানীরা নিজেদের মাতৃভাষা কুরবাতি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের আইডেন্টিটি বজায় রেখেছে। কুরবাতি ভাষা ব্যবহার-ই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তারা নোম্যাডিক জাতি, কারণ কুরবাতি ভাষা ডোমারি-র (Domari) একটি উপভাষা। এছাড়া তাদের পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ নারীরা এখনো তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত পোশাক অনেকটা ঘাগ্রা-র ন্যায় পোশাক পরিধান করে। একুশ শতকেও ইরানী গোষ্ঠীতে সর্দারী প্রথা চলে। তবে একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয় বিগত কয়েক দশেক আগে এই ইরানীরা যে অবস্থায় ছিলো সেখান থেকে তাদের মধ্যে থেকে অনেকে উঠে এসে মুর্শিদাবাদের বুকে নিজেকে অর্থনৈতিক ভাবে যথেষ্ঠ মজবুত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বর্তমান লালবাগ থানার অন্তর্ভুক্ত হাজারদুয়ারী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার এম.এল.এ মেহেদি আলমের (মির্জা) সঙ্গে কথপোকথনের সুত্রে জানা যায়– ইরানী জনগোষ্ঠী মুর্শিদাবাদে বরাবরই আছে মুর্শিদকুলির আমল থেকে। এখন তারা সবাই-ই উর্দুভাষী। কিন্তু যাদের ভাষা কুরবাতি তারা তাদের সঙ্গে সাবেকী ইরানীদের কোনো সামাঞ্জস্য নেই। তার দাবী অনুযায়ী শুধু তিনিই নন, তার পিতা সায়েদ নবাব জানি মির্জা যখন এম.এল.এ পদে ছিলেন সেই সময়ে কুরবাতি ইরানীরা সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও মহরমের সময় প্রতি বছর মহরম পালনের উদ্দেশ্যে আসতেন এবং হাজারদুয়ারির পিছন ভাগে যে ফাঁকা অংশটি আছে সেখানে তাবুতে দুই মাস ধরে প্রায় থাকত। তারপরে তারা চলে যেতেন। আজকে যে সাজানো গোছানো সীমান্ত এঁকে দেওয়া হাজারদুয়ারিকে দেখি তা দুই-দশক আগে অবধি এমন ছিলনা, বর্তমানে ঐতিহাসিক হাজারদুয়ারীর সৌন্দার্যায়নের ও নিরাপত্তার সার্থে পুরোটাই সরকারী আধিকারিকদের মধ্যস্থতায় পরিচালিত হয়। তাই কুরবাতি ইরানীরা নবাবী সম্পত্তির আওতায় যে জমিনগুলো আছে নবাব বংশীয়দের সম্মতিতেই ধীরে ধীরে তারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করে ১৯৮০ এর পরপর থেকেই।

এখন হাজারদুয়ারী এলাকায় প্রায় ১৫০ পরিবারের বেশী কুরবাতি ইরানীরা বসবাস করে। তিনি জানিয়েছেন যে তারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসত। যাযাবরীয় জীবনযাত্রা হওয়ার কারণে তাদের কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিলনা। সেই কারণেই তাদের প্রবেশ ভারতবর্ষে যখনই হয়ে থাকুক তাদের কোনো নাগরিকত্ব ছিলনা। ভারতবর্ষ নানা জাতির দেশ, আমাদের দেশে নানা উপজাতি আছে তারা ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু কুরবাতি ইরানীদের কোনো প্রামাণিক বা দলিল ছিলনা। মেহেদি আলম এবং তার পিতাও তাদের নাগরিকত্ব পেতে প্রভূত সাহায্য করে এসছেন। আসলে যে কোনো দেশে বসবাস করলে তার যে প্রমানপত্র থাকতে হয়, এই চেতনাই তাদের মধ্যে ছিলনা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে জীবনযাত্রার মান পাল্টেছে, তাই সেই তাগিদ থেকে তারা নাগরিকত্ব লাভ করেছে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, সন্তানদের স্কুলে দাখিলার ক্ষেত্রে, তীর্থ করতে দেশের বাইরে যাওয়া, সিমকার্ড ক্রয় করা, রান্নার গ্যাস ব্যবহারের- মত বহু সমস্যার মুখোমুখি পড়ার কারণে তাদের স্থায়ী প্রমানপত্রের প্রয়োজন। এমন প্রতিনিয়ত বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তারা তাদের অনিশ্চিত জীবনযাত্রার থেকে স্থায়ী জীবন যাপনের মধ্যে যে সুবিধা তা তারা বুঝতে পারলো।

কুরবাতি ইরানীদের বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবস্থা

গোড়া ইসলামপন্থিদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে বিষয় টি লক্ষ্য করা যায় তা হল পরিবারে পুত্র সন্তান কে শিক্ষিত করার কিছুটা তাগিদ থাকলেও কন্যা সন্তানদের মুক্ত ভাবে বিদ্যালয়ে যাওয়ার কিংবা অবাধ বিচরণ করার কোনো স্বাধীনতা নেই। প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে আর কোনও পুঁথিগত শিক্ষা অর্জন করা অনুমতি তাদের নেই। মনের গোড়ামো থেকে তৈরি হতে থাকে নানা টুকরো দেশ, এক ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য আর একটি ভূখন্ড তৈরি করেছে কুরবাতি ইরানীরা। যারা ভারতীয় চিন্তা-চেতনার একেবারে বাইরে অবস্থান করে আছে। ইরানীয় পরিবারের কোনো মেয়েকে একুশ শতকে পৌছে বিদ্যালয়ে দাখিলা করানো হয়না। শিক্ষার যে গুরুত্ব তা তাদের কাছে পুরোটাই অজানা। এদের বিষয়ে জানার আগ্রহ থেকেই অনেক ইরানী পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছে, সেই পরিচয় থেকে যে তথ্য উঠে এসেছে তা বিস্ময়কর। গোটা ইরানী গোষ্ঠীর কোনো মেয়ে তো দূরের কথা কোনো ছেলে এখনো অবধি কলেজে দাখিলা নেয়নি এবং স্কুলেও খুব সামান্য সংখ্যক যে ছাত্ররা আছে তারা ও তার পরিবার বোর্ডের পরীক্ষার ব্যাপারে কোনো সচেতন ধারণা রাখেননা।

আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ইরানীদের অবস্থা বর্তমানে স্বচ্ছল হলেও শিক্ষার বিষয়ে তাদের মানসিকতার কোনো পরিবর্তন নেই।

হাজারদুয়ারী এলাকায় নবাব বাহাদুর ইন্সটিটিউসন নামক বিদ্যালয়টির একজন উর্দু বিভাগের শিক্ষক সায়েদ হাসান ইমাম[৩৪] তার প্রায় কুড়ি বছরের শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, বর্তমানে ইরানী ছাত্রী প্রায় নেই-ই, ২০০৭-২০১২ -এর মধ্যে গড়ে ৩০ জনের কাছাকাছি দাখিলা নিতে তিনি দেখেছেন, ২০১৮ সালে কমে দাঁড়িয়েছে গোটা দশেক। তবে এও তিনি জানিয়েছেন যে অনেকেই ইদানিং ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গুলোতে ইরানীরা তাদের সন্তানদের পড়াশোনা করাচ্ছেন। তার কারণে হয়ত ছাত্র ইরানী ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে ইরানী মেয়েরা একেবারেই নেই। প্রাথমিক চাহিদা খাদ্যের অভাব পুরণে ব্যস্ত ইরানী কোনোদিন শিক্ষাঙ্গনে পা রাখেনি, বর্তমানে তারা বেশি দূর এগোতে না পারলেও বিদ্যালয়ের গন্ডি পার করছে। ইরানীরাই স্বীকার করেন তারা মুর্শিদাবাদের আসার পূর্বে তাবুতেই জীবন যুদ্ধ চালিয়েছে ফলে ধর্মীয় শিক্ষালাভও তাদের ভালোভাবে হয়ে ওঠেনি, এখন তারা মক্তব থেকে আরবি শিক্ষা করছে এবং ধর্মীয় শিক্ষা (নামাজ পড়া, ইসলামীয় মতে নিজের পর্দা করা, রোজা রাখা, সুন্নতি শিক্ষা) তারা পেয়েছে নবাব বংশীয় সায়েদা ফীরদৌসী বেগমের (৫৬) [৩৫] কাছ থেকে।

পেশা

'খানা-বাদোশ'[৩৬] এর জীবন থেকে তারা তাদের জীবনযাত্রায় আমুল পরিবর্তন এসেছে শেষ দুই দশকে। এদের বিষয়ে স্থানীয় মুর্শিদাবাদী যারা এদের সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হতে দেখেছেন তারা বলেন ইরানীয় কুরবাতিদের আর পূর্বের অবস্থাতে নেই। তবে তাদের পরিবর্তনের পিছনে নবাবিদের সমর্থন[৩৭] পুরোপুরিই ছিল এবং এখনো আছে। তাদের মাথার উপর নিরাপত্তার আশ্রয় ছিলনা, তাবুই ছিল তাদের সম্বল। পেশা ছিল ভাগ্যবিচার করা, এবং জ্যোতিষ মতে পাথর বিক্রি করা। এই পেশাকে আঁকড়ে ধরে ইরানী পরিবারের কয়জন

[34] ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার: সায়েদ ইমাম হাসান। নবাব বাহাদুর বিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ। ১৩-০৭-২০১৮।

[35] ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার: ফিরদৌসী বেগম। চক মোড়, ভি.আই..পি গেট মুর্শিদাবাদ। ২১-০৩-২০১৮।

[36] খানা বাদোশ' একটি উর্দু শব্দ। এই খানাবাদোশরা ঠিক আশ্রয়হীন তা বলা যায়না, এঁদের নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা নেই। খানাবাদোশ সেই মানুষ যারা নিজের কাঁধে নিজেদের ঘর বয়ে বেড়ায়। এই যাযাবরীয় মানুষগুলি 'বানজারা' নামেও পরিচিত।

[37] ব্যক্তিগর সাক্ষাতকার: মেহেদি আলম (MLA)। চক মোড়, ভি.আই.পি গেট মুর্শিদাবাদ। ২১-০৩-২০১৮

ছাড়া বেশ কজন ইরানী হিরের ব্যাবসা করে নিজের আর্থিক ভাগ্য পরিবর্তন করে নবাবী জমিন থেকে উঠে এসে, নিজের মালিকানায় জমি কিনে নিজেদের ইমারত গড়ে তুলেছে। যদি সব ইরানী আর্থিক ভাবে এমন স্বচ্ছল হয়েছে তা-নয়। তবে আজ তারা তাবুতে থাকেনা। ইরানী নারীরাও কোনোরকম পেশার সঙ্গে যুক্ত নয়। বাঙালী কিংবা অবাঙালী অনেক মহিলা তারা যথার্থ শিক্ষিত না হলে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই চেষ্টা বর্তমানে ইরানী নারীদের নেই। পরিচারিকার কাজ করেও বহু নারী তাদের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ইরানী নারীরা অর্থ উপার্জন কিংবা স্বনির্ভর হওয়ার ভাবনা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। তারা গৃহকর্মের মধ্যেই নিজেদের ব্যস্ত রাখে। মুর্শিদাবাদে সাধারণ ঘরে ঘরে নারীরা হস্তশিল্পের কাজে নিজেদের দক্ষতা দেখিয়ে চলেছে। কিন্তু একই স্থানে থেকে ইরানী নারীরা তাদের কাজের দক্ষতাকে বাইরে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি। বর্তমানে বেশির ভাগ ইরানীরা দরিদ্র সীমায় অবস্থান করলেও পুরুষেরাই সমস্ত ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। তবে হাজারদুয়ারীর ভিতরের পথটিতে দু-তিন জন বৃদ্ধ ইরানী নারীকে চশমা বিক্রি করতে যায়। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে সংসারিক ন্যূনতম ব্যয় বহন করার স্বার্থেই চশমা বিক্রির কাজকে তারা বেছে নেন। কারণ তাদের নিজেদের বাসস্থানের থেকে দূরে গিয়ে কাজ করার অনুমতি নেই। হাজার দুয়ারিতে অনেক মানুষের সমাগম হয় ফলে, অর্থ উপার্জনের জন্যে এই স্থানের থেকে ভালো উদাহরণ তাদের সামনে নেই। বিক্রি করার উপাদান হিসাবে চশমাকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসাবে তারা জানিয়েছেন, চশমার সহজলভ্যতা এবং বয়ে নিয়ে আসা তাদের জন্যে অনেক সহজ , এছাড়া কোনো প্রকার খাদ্যদ্রব্য বিক্রি তারা করেনা, তার কারণ ইরানী খাবারের চল বাইরে সে ভাবে নেই, ও মূলধনের অভাব তো বটেই। সর্বোপরী ইরানী গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত হয় সর্দারতন্ত্রে। তাদের অনুমোদন অনুযায়ি কোনো অসহায় নারী একান্তই যদি অর্থ উপার্জন করতে চায় চশমা বিক্রিই সব চেয়ে সহজ পথ। তবে কর্মসূত্রে সমস্ত ইরানী পুরুষেরা বাইরে থাকেন। বেশীরভাগ পেশার সূত্রে কোলকাতাতেই থাকেন। কোনো অনুষ্ঠান যেমন মহরম, ঈদের সময় তারা ঘরে ফেরেন।

মুর্শিদাবাদে ইরানী সংস্কৃতির পত্তন

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যাদের মধ্যে একচ্ছত্র একতা ছিল, তাদের মধ্যেই আর্থিক পরিবর্তনের কারণে অপ্রকাশিত ও অলিখিত একটি আলাদা ক্লাস তৈরি হয়েছে। আর্থিক কারণে কোনো কাজে বিশেষ কোনো

পরিবার পিছিয়ে পড়লে মিলিত উদ্যোগে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এদের বিবাহ রীতির সঙ্গে নবাবীদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নবাব পরিবাররা যেমন নবাবী পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা বজায় রাখেন, তেমনই ইরানীদের বিবাহ নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যেই হয়। বিবাহ প্রথা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা কারণে মুর্শিদাবাদের ইরানী জাতি মিলেমিশে যায়নি। ধর্মীয় শিক্ষা বা সংস্কৃতিক রীতি-নীতি গুলি কুরবাতি ইরানীরা নবাবী পরিবারের কাছ থেকে পেলেও বিবাহর ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার স্থাপনের স্থান নেই। মুর্শিদাবাদে শিয়াপন্থিরা আর্থিকভাবে ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার পরই যায়গায় যায়গায় ইমামবাড়ি তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকটি ইমামবাড়ি সজ্জিত হয়েছে আলাম, মিম্বার, পাঞ্জেতান পাকের নাম খোদাই করা নিশান, ঝুলা, ইমাম হোসেনের ঘোড়া জুলজানহ্- এর কাল্পনিক ছবি, ইমাম হোসেনের কাল্পনিক কর্তন করা হাত, মাশকিজা-র মত কারবালা কেন্দ্রিক বিষয় গুলি দিয়ে। তাদের এক একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, তারা আলাদা আলাদা ভাবে মহরম পালন করে।

মুর্শিদাবাদের মুসলিম শিয়া সম্প্রদায়ের অভূত্থান সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপিত হলে, বাংলায় মুসলিমদের আগমন ও শিয়া দর্শন সম্পর্কে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে শিয়া দর্শনের যোগ কোথায় এবং কি ভাবে মুর্শিদাবাদে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমরা শিয়া হিসাবে নিজেদের আলাদা সত্তা তৈরি করেছে সেই প্রশ্ন উঠেই আসে। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের পত্তন ও গঠন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, ১২০৩ খিষ্টাব্দে ইখতিয়ার-উদ্দিন-মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি-র বাংলা বিজয় থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খিষ্টাব্দে সিরাজ-উদ-দৌল্লার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশো বছরের এই দীর্ঘ সময় কালে বাংলায় মুসলমান সমাজের পত্তন গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। বাংলায় মুসলিম ভাবধারার বিস্তার ঘটে ইখতিয়ার উদ্দিনে হাত ধরে। এই সময়ের মধ্যে মুসলমানরা সুলতান-সুবেদার-নবাব-নাজিম পদে বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। স্বাধীন সুলতান আমলেই সমগ্র বাংলাদেশের নাম হয়েছিল বাঙলা। বাংলায় রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রকৃতিগত সময়সীমা বিভাজন করা হয়েছে এইভাবে – ১২০৪-১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ ও ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ (স্বাধীন রাজ্য); ১৫৩৮-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ (আফগান কর্তৃত্ব); ১৫৭৬-১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দ (মুঘল সুবা); ১৭১৭-১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ (স্বাধীন নবাব)। বর্তমানে মুর্শিদাবাদে শিয়াপ্রভাব দেখা যায় লালবাগ, ভরতপুর, সালার, জঙ্গীপুর বিভিন্ন স্থানে। আমাদের দেশে সুলতানি ও মোঘল আমলেই ইরানীরা ছড়িয়ে পড়ে। মহরমের সময়ে এই ইরানী শিয়া প্রভাব

খুব ভালো করে বোঝা যায় যেখানে সাড়ম্বরে মহরম উৎসব পালিত হয়। মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলি খানের[৩৮] (১৭১৭-১৭৫৬) সময় থেকেই শিয়া প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদের যে তিন রাজবংশ মূলত রাজত্ব করেছে– নাসিরি, আফসার এবং নাজাফি রাজবংশ, এই তিন বংশই শিয়াদর্শনে বিশ্বাসী ছিলো। মুর্শিদাবাদের রাঢ় এলাকায় বহিরাগত মুসলমানের বসতিস্থাপন হয় তুর্কি পাঠান মোগল আমল থেকেই। তবে মুর্শিদকুলির সময় থেকেই পারস্য থেকে বহু পরিবার মুর্শিদাবাদে পাকাপাকি ভাবে বসতি স্থাপন করে। মুর্শিদকুলি তিনি একজন ইরানীর সহচর্যে বড় হওয়ার কারণে, ইরানীদের প্রতি তার আলাদা সহানুভুতির যায়গা ছিল। বলা বাহুল্য তিনি খোরাসানের[৩৯] আফসার তুর্কিদের গোষ্ঠীভুক্ত এবং সেখানের প্রসিদ্ধ ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শুধু তাই নয় তাঁরই সময়কালে মধ্য এশিয়া ও বাগদাদ থেকে বহু সুফিসাধকরা ধর্ম প্রচারের জন্যেও আসে বঙ্গদেশে। এর পরে আফসার[৪০] বংশোদ্ভূত আলিবর্দী খানের সময় কালেও মহরম পালনের ঐতিহ্য বহাল ছিল। আলিবর্দীর উত্তরসূরী সিরাজ-উদ-দৌল্লা মহরম পালনের উদ্দেশ্যে ইমামবাড়ি তৈরি করেন।

---

[38] নবাব মুর্শিদকুলি খান অধিক পরিচিত বাঙলার সুবাদার জাফর খান নামে। তিনি আদিতে একজন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। খুব সম্ভবত ওড়িষ্যা বা দাক্ষিনাত্যের দিকে। তার বাল্যকালে শফি ইস্পাহানি নামক এক উঁচু স্তরের ইরানী কর্মকর্তা তাকে ক্রীতদাস হিসাবে ক্রয় করেন এবং পরে মোহাম্মদ হাদি নামকরণ করে তাকে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করেন ও যথার্থ শিক্ষাদান করেন। খুব সম্ভবত ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে হাদিকে নিয়ে তিনি নিজ দেশ ইরানে চলে যান। পিতৃসম শফির মৃত্যু হলে হাদি ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ফিরে আসেন এবং বেরার প্রদেশে দিওয়ান আব্দুল্লাহ খোরাসানির অধীনে চাকরী নেন। এরপরে ক্রমশ তার পদোন্নতি ঘটতে থাকে ও পরে তিনি মনসবদার পদে উন্নীত হন। এই সময়ে তিনি কারতলব খান উপাধি লাভ করেন। কর্তব্য ও কাজের প্রতি নিষ্ঠা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, অসাধারণ প্রতিভা ইত্যাদি কারণে তিনি প্রথমে বাঙলা সুবার দিওয়ান ও পরে সুবেদার পদে নিযুক্ত হন সম্রাট কর্তৃক। তিনি মুর্শিদকুলি খান ও পরে জাফর খান উপাধি লাভ করেন। সম্রাট ওরঙ্গজেব তাকে তার নিজ পৌত্র আজিম-উস-শানের চেয়ে অধিক বিশ্বাস করতেন।- হোসেন খান তাবাতাবায়ি, সৈয়দ গোলাম (২০০৫) । *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* । ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ।

[39] খোরাসান নামে পরিচিত ইরানের পূর্বাঞ্চলে এবং সেই সঙ্গে তাব্রিজ থেকে মেশেদ পর্যন্ত সেই সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে অসংখ্য তুর্কির বসতি ছিল এবং তাদের বেশির ভাগ তাবুতেই বসবাস করতেন। সেনাদলে চাকুরি, মেষপালন, কৃষিকাজ ছাড়া তারা অন্য বিশেষ কোনো কাজ করতেন না। কারণ ইরানের আদিঅধিবাসীরা সেনাবাহিনীর কাজে খুব দক্ষ ছিলেন না এবং তাদেরকে তুচ্ছার্থে ‘তাও’, ‘তাজিক’ অথবা ‘বুরঘার’ (Burghar) বলা হতো। অবশ্য ‘ভাতিয়ার’ বা ‘ভাত্রিয়ান’ (Bahtrians) নামে কিছু পরিচিত উপজাতীয় লোক খুব ভালো সৈনিক হতেন। পার্বত্যাঞ্চল অধিবাসী হলেও তারা ভালো অশ্বারোহী ছিলেন। ইতিহাসখ্যাত করিম খান ছিলেন ভাতিয়ারি এবং দুধর্ষ নাদির শাহ ছিলেন আফ্সার।
দ্র: হোসেন খান তাবাতাবায়ি, সৈয়দ গোলাম (২০০৫) । *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন* । ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ।

[40] আলীবর্দী খানের মা ইরানের খোরাসানের এক তুর্কি উপজাতি থেকে এসেছিল, আলিবর্দী খান সেই অর্থে ইরানীয় ছিলেন। যদিও তাঁর পিতা মির্জা মোহম্মদ আরব বংশোদ্ভূত, তিনি মুঘল দরবার থেকে খান উপাধি পেয়েছিলেন।
দ্র: হোসেন খান তাবাতাবায়ি, সৈয়দ গোলাম (২০০৫) । *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ।*

ইমামবাড়ির মাঝখানে আছে মদিনা। কথিত আছে ৬ ফুট গর্ত করে এই মদিনা তে মক্কার মাটি এনে তা ভরাট করা হয়েছিল। হজ্বের সময় অর্থাৎ আরবি জিলহজ্ব মাসে অনেকেই ইমামবাড়ির মদিনা দর্শনে আসতেন যাঁদের পক্ষে আরবে হজ্ব করতে যাওয়ার সামর্থ্য ছিলনা। হজ্বে আসার বিষয়টি বর্তমানে প্রচলিত নেই কিন্তু মদিনা নামক যায়গাটি নবাবী আমলের ইতিহাসকে সাক্ষী দিচ্ছে। নবাবী সময় থেকেই ইমামবাড়ি ছিল মহরম পালনের মূল কেন্দ্র। আরবী বছরের মহরম মাসের প্রথম দশদিন খুব জৌলুসের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে তাজিয়া, মিম্বার, ঝুলা, আলম বের করে ও মার্সিয়া বা নহা পাঠের মাধ্যমে, অথবা মাতম করে। কয়েকশো লোক জোড়ো হয়ে বাতি জালিয়ে অপরূপ দৃশ্য তৈরি করতেন ইমামবাড়িতে। বর্তমানে ইমামবাড়িতে ও হাজারদুয়ারীর মিউজিয়ামে নবাবী আমলের একাধিক আলম, ঝুলা, মাশ্‌ক, তাজিয়া ইত্যাদি মহরম পালনের সামগ্রীর নজির খুব যত্নে সংরক্ষিত আছে। মুর্শিদাবাদে নবাবী আমল থেকে বর্তমানকাল অবধি শিয়া সংস্কৃতির অন্যতম মূল অংশ মহরম পালন করা, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে শিয়া-কালচার কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়।

সায়েদ রেজাআলি মির্জার দেওয়া তথ্য অনুসারে মুর্শিদাবাদের কুরবাতি ভাষাভাষি ইরানী যারা নিজেদের ইরানী বলে পরিচয় দেয় নবাব বংশের ইরানীদের সঙ্গে মানসিকতা, রুচি বোধের জিপসী ইরানীয়দের কোনো মিল নেই। আলিবর্দি খাঁ থেকে যারা বাংলায় রাজত্ব করেছেন তারাই ‘প্রকৃত’ ইরানী। সায়েদ, মির্জা পদবীধারী যারা মুর্শিদাবাদে আছেন তারা সকলেই ইরানীয় বংশধর। ইরানীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বাঙালিদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য করে রেখেছে, যেমন ইরানীয়রা উচ্চতায় স্বাভাবিক(৫’৫-৬ফুট) গায়ের রঙ লালচে ফর্সা তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬-১৮ বছর পার করলেই গায়ের রঙ পরিবর্তন হয়ে অতিমাত্রায় লাল হয়ে যায়, এর জন্যে আবহাওয়া দায়ী, চোখের রঙ সবুজ নীল, খয়েরি হয়ে থাকে। কুরবাতি ভাষাভাষী ইরানীদের মুল স্বাতন্ত্র্যতার যায়গা হল ভাষা, ফারসি ভাষার একটি উপভাষা কুরবাতি তাদের মাতৃভাষা এছাড়া উর্দুভাষাতেও তারা বর্তমানে সাবলীল, বাংলা তারা বুঝতে পারলেও বলতে পারেনা, এদের কেউ কেউ যারা ব্যবসা সূত্রে কলকাতা যাওয়া-আসা করার কারণে তারা বাংলাভাষাকে কাজ চালানোর মত করে রপ্ত করেছে। সঠিক সময়ের কথা জানাতে না পারলেও তিনি জানান ইরানীয়রা আসলে যাযাবর যারা অনেক কাল আগেই ভারতে এসেছে, কিন্তু নবাবী (মুর্শিদকুলির সময়) আমল থেকেই মহরম পালন খুব জৌলুসের সঙ্গে পালিত হত। শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মহরম পালনের ঐতিহ্য অনেক পুরানো, সেই ঐতিহ্যকে বজায় রাখতেই ইরানীয়দের নিয়ে আসা হত মাতম করার জন্যে। এইভাবে বেশ কিছু ইরানী এখানে থেকে যায়, যারা

অনেকেই নবাবের প্রিয়ভাজন ছিলেন। যাদের রুচি-আচার-আচরণের সঙ্গে 'কুরবাতি' ভাষাভাষী ইরানীদের কোনও মিল নেই। সায়েদ রেজা আলি মির্জা নিজেকেই প্রকৃত ইরানী বলছেন, তার কথা অনুযায়ী বর্তমানে যে ইরানীরা আছেন তারা ইরান থেকে একসময় ভারতে প্রবেশ করেন, কিন্তু মুর্শিদাবাদ ছাড়াও মালদা, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, আসাম, বিহার প্রভৃতি স্থানে যাযাবরের মতই আছেন। তারা এদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার একটাই কারণ- ইমাম হাসান এবং হোসেনকে তারা অনুসরণ করে, সেই কারনের জন্যই নবাববংশীয় ইরানীয়রা কুরবাতি ভাষাভাষী ইরানীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল।

উপসংহার

কুরবাতি ইরানী ও নবাবীরা একে অপরের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতিকে ভাগ করে নিয়েছে। সংস্কৃতির আদান-প্রদানের এই নজির বাঙালী মুসলিমদের সঙ্গে তাদের গড়ে ওঠেনি। তার মূল কারণ হল ধর্মীয় বিশ্বাস, ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও স্থানীয় মুসলিমরা সুন্নি এবং নবাবী ও কুরবাতী ইরানীরা শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায়, দুই ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী মুসলিমদের সংস্কৃতির যোগ নেই। তবে স্থানীয় শিয়া যারা আছেন, তাদের বেশির ভাগ মুর্শিদকুলি খানের আমলে যারা এসেছিলেন, তারাও শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে মহরমের বেশীর ভাগ আচারগুলি সঙ্গে নবাবীদের আচারের মিল রয়েছে। তাদের বেশীর ভাগই যুক্তির আলোকে মহরমকে বিচার করেন। হোসেনের প্রতি প্রেম তাদের অন্তরে থাকলেও নিজেকে আঘাত করার মধ্যে দিয়ে প্রেম প্রকাশে তারা সহমত নন। তারাও নহা, মার্সিয়া, সালাম পাঠ করেন, এই পাঠের মধ্যে দিয়ে অন্যান্যদের মত দীর্ঘ দুই মাস ব্যাপী শোক পালন করেন, তবে নিজ রক্তক্ষরণ বা আঘাত করার প্রথায় তারা অংশ নেননা, বরং জল দান, কিংবা রক্তদান শিবিরের মধ্যে দিয়ে সামাজিক কল্যাণকর্মে মহরমের সময়ে নিজেদের নিয়োজিত করেন। তবে হাজারদুয়ারীর মূল ইমামবাড়িতে ৯ মহরমে সকলে একই সঙ্গে হোসেনের স্মরণে বিলাপযাত্রায় অংশ নেয়। তবে লক্ষ্যনীয় কুরবাতিদের সঙ্গে নবাবীদের জীবনযাত্রা, মানসিকতার কোনও মিল না থাকলেও আলি ও হোসেন প্রেম তথা শিয়াদর্শনে বিশ্বাস – তাঁদেরকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত নির্বাচিত নহার আলোকে ‘কারবালা’ প্রসঙ্গের পুনর্বিবেচনা

ভূমিকা

ইসলাম ও শিয়া দর্শনের গভীরতা বুঝলে তবে ‘নহা’ বা অন্যান্য কারবালা কেন্দ্রিক সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছে তা পর্যালোচনা করা বোঝা সম্ভব। কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়াতে যে সাহিত্যধারা গড়ে ঊঠেছিল সেখান থেকে তা কি ভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে সেই দিকটি এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ইসলামী সাহিত্যধারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। ইসলামী সাহিত্য ভারতবর্ষে শুরু হয় ইসলামী শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে, উল্লেখ্য যে কারবালাকেন্দ্রিক শোকগাথাগুলি লেখা শিয়া মুসলিম শাসকদের আমলে।

সুলতানী, মোঘল রাজবাংশের মত একাধিক রাজবংশ শাসন করলেও তারা কেউ শিয়া ছিলেন না, ভারতবর্ষে শিয়া শাসন সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেছিল হায়াদ্রাবাদে ও আওয়াধে বা লখনৌতে। হায়দ্রাবাদে কুতুবশাহী ও আসাফজাহি রাজবংশ ছিলেন শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী, অন্যদিকে আওয়াধেও সাফাভিদ রাজবংশ ছিল শিয়াপন্থি, উত্তর ভারতের উর্দু সাহিত্য ভারতবর্ষে সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল বুরহান-উল-মুল্‌কের সময়ে। বাংলার নবাবীরাও শিয়াপন্থি ছিলেন এবং সকলেই ইরানী ফলত তাদের সংস্কৃতিতে শিয়া প্রভাব থাকাটাই খুব স্বাভাবিক। মোঘল শাসন যখন প্রায় অস্তমিত তখন থেকেই ভারতবর্ষে বাংলা, হায়াদ্রাবাদ, আওয়াধের মত স্থান গুলিতে মুসলিম শাসন গড়ে ওঠে, যাদের সকলের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে ইরানী যোগ রয়েছে। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের হাত ধরে সতেরো শতকের শুরু থেকে শিয়া প্রভাব পড়তে শুরু করে, আর সেখান থেকেই কারবালাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চা শুরু হয়।

শিয়া সম্প্রদায় ও কারবালার ঘটনা এবং নহা সম্পর্ক

মুর্শিদাবাদে যে শিয়াপন্থিরা আছেন তারা মূলত বারোপন্থি শিয়া মুসলিম। সর্বজনীন ভাবে ইসলাম ধর্ম অর্থেই আল্লহ এবং তার রসুলের ওপর বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের ভিত হলো কলেমা[৪১] (আল্লহকে বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি) শাহাদাত- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ', অর্থাৎ আল্লাহ অদ্বিতীয়, মহম্মদ হলেন আল্লহ প্রেরিত রসুল, আসলে কলেমা আবৃত্তির মাধ্যমে আল্লহের একত্ব এবং মোহম্মদের নবুয়তের উপর আস্থাস্থাপন নিছক একটি বিশ্বাস নয়, তার জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি মুহুর্তকে অনুশীলনই হল ইসলামধর্ম পালন। আল্লহর প্রতি এই আনুগত্য মুসলমানকে মুক্ত করে অপর যে কোনো শক্তি বা দেবতার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রদর্শন থেকে। আল্লহ সবকিছুর চেয়ে বড় এই চেতনা যে কোনো রাজরাজড়া বা শাসকের প্রতি অনুগত থাকার আবশ্যিকতা এবং যে কোনো মানবিক দুর্বলতার বশবর্তী হওয়া থেকে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি জানায় ঈশ্বরের একত্ববাদে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে কোনণ সিস্টেম, দল, শসক বা সেরকম অন্যান্য বন্ধন দ্বারা কিংবা পরিণত হয় ভাবাবেগ ও চিত্তাবেগের শিকারে। ইসলামের একাধিক মতাদর্শ তৈরি হলেও সব কটি মতাদর্শই আল্লহর একত্ববাদ এবং আল্লহ প্রেরিত রাসুলের প্রতি বিশ্বাসকেই কেন্দ্রে রেখে তৈরি হয়েছে। সুন্নি মতাদর্শতে আল্লহ এবং আল্লহ প্রেরিত রাসুলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করাকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর পরেই সুন্নি মতাদর্শের পরে ইসলামি বিশ্বে জনপ্রিয় মতাদর্শ হল শিয়া মতাদর্শ। তারা শুধুমাত্র আল্লহ ও রাসুলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেনা, বরং ১৪ মাসুমিনের[৪২] প্রতি তারা অনুগত।

---

41 আল্লহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, রাসুল তাঁর প্রেরিত দূত এই ধারনা ইসলামের গোড়া থেকেই আছে যে ধারণা আজও অপরিবর্তিত, কিন্তু শিয়া পন্থিরা এমন কলেমা পাঠ অনেকটা আলাদা যেখানে আলির গুরুত্ব পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে । তাদের কলেমা এরূপ- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (আল্লহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মহম্মদ রসুল্লাহ আল্লহ প্রেরিত শেষ নবি) / আলিউন ওয়ালি উল্লাহ (আলি আল্লহ প্রিয় ওলি বা প্রিয়) / ওয়াসিউ রাসুলিল্লাহ (রাসুলের উত্তরাধিকারি তিনি) / ওয়া খালিফাতুহু বিলাফাসাল তিনিই রাসুলের প্রথম খলিফা" ।

42 মাসুমিন শব্দের অর্থ হল পবিত্র সত্তা। আল্লহ ও তার রাসুল ১৪ মাসুমিনের মধ্যে প্রথম দুটি সত্তা, এছাড়া পর পর ১২ টি মাসুমিনরা হলেন রাসুল কন্যা ফাতিমা, জামাতা আলি, আলি দুই পুত্র হাসান ও হোসেন , এরপর হোসেন বংশ পরম্পরায় হয়ে আসা ৮ জন ইমাম। যথাক্রমে হোসেন বিন জয়নুল আবেদিন, মহম্মদ বাকার, জাফার-ই-সাদেক, মুসা-এ- কাজিম, আলি রাজা, মহম্মদ তাকি, আলি নাকি, হাসান আসকারি, ইমাম মেহেদি– মুর্শিদাবাদের শিয়াপন্থিরা সকলে ১২পন্থি শিয়া মুসলিম কারণ তারা ১২ জন ইমামের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী ইমাম স্বয়ং আল্লহ দ্বারা নির্বাচিত, বনু হাসেমী বংশের অর্থাৎ রসুলের বংশধরই ইমাম পদে অধিষ্ঠীত হতে পারবেন। কারবালার ঘটনায় এজিদ বাহিনী পুরো পাঞ্জেতান পাকের(মহম্মদ,ফাতিমা, আলি,হাসান,হোসেন) পরিবারের সব কটি প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। হোসেন পুত্র জয়নুল আবেদীন অসুস্থ থাকার কারণে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পারেনি। পরবর্তিতে জয়মুলের হাত ধরেই আহলে বায়াতের পরিবার জীবিত ছিল। হোসেন মৃত্যুর পরেই কারবালার নির্মম ঘটনার সাক্ষি অনেকেই ছিল। অনেকেই জয়নুলে আবেদিনের কাছে বায়াত গ্রহন করে। এই খান থেকেই পাকাপাকি ভাবে শিয়াপন্থিরা নিজেদের আলাদা করে নেন আহলে বায়াতের প্রতি অনুগত থাকে।

ইসলামের তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত এক হলেও তাদের কলেমা কিন্তু এক নয়, ইসলাম যে স্তম্ভ গুলি আছে তার মধ্যে কলেমা পাঠ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এমন নয় যে শিয়াপন্থিরা আল্লহ প্রেরিত রসুলে গুরুত্বকে স্বীকার করছেনা, তাদের দর্শন বিচার করলে দেখা যায়, তারা ধর্মীয় ভাবাবেগের গভীরতা কোনখানে, এর পূর্বেই আলোচিত হয়েছে ইসলামের নানা মতাদর্শ নিয়ে, সেখানের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধন্তে আসা যায় যে, ইসলামের বিভাজন শুধু মাত্র রাজনৈতিক বিভাজন নয়, বিভাজনের সুত্রপাত রাজনীতি থেকে হলেও পরবর্তীতে ধর্মীয় ভাব সপৃক্ত হয়ে জন্ম নেয় আলি ও তার পুত্রদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম একেবারেই নতুন ধর্ম। মহম্মদের সময়ে তিনি তার চারিত্রিক গুণের মহিমায় বহু পৌত্তলিককে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিলেন। কিন্তু একের পর এক সেই সময়ের ইসলামি বিশ্বে আঘাত নেমে আসে কিছু ছদ্মবেশী প্রতারকের কারণে। ইসলামে মহম্মদের পরে গড়ে উঠেছে নানা মতবাদ। হাদিস বলতে যা বোঝানো হয়, তা হলো রাসুলের জীবদ্দশায় তিনি যে বাক্যের ব্যবহার করেছিলেন এবং যা পালন করতেন তার প্রাত্যহিক জীবন সে সমস্ত বিষয় নথিবদ্ধ করতেন তার সাহাবারা। সাহাবা এবং পারিবারিক সূত্রে পাওয়া তথ্যও অনেক সময় হাদিস বলে গণ্যিত হয়েছে। একসময় আবু সুফিয়ানের ভাই আবদুল্লা ইবনে সাদ মিশরের শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত ছিল, শুধু তাই নয় আব্দুল্লাহ রাসুলের সচীবও ছিল। যখন মহম্মদ তার প্রত্যাদেশ লিপিবদ্ধ করার জন্যে বলতেন তখন শব্দ পরিবর্তন করে ব্যবহৃত বাক্য গুলিকে অস্বাভাবিক করে তুলতেন[৪৩]। তার জালিয়াতি ধরা পড়লে সে পালিয়ে যায়। ফলে হাদিস সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক মতভেদও অনেক আছে। শত মতভেদের মধ্যেও ইসলাম যেখানে তার একত্বকে বজায় রেখেছে তা হল আল্লহ এবং তার রাসুলের ওপর বিশ্বাস।

এই একত্বের মধ্যেও আছে বিস্তর ফারাক। শিয়াপন্থিদের ধর্মদর্শন আলোচনা করতেই শুরুতে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হল, তা হলও তাদের ধর্মীয় আচার ও ধর্ম বিশাস। মুসলিম সুন্নিপন্থিরা নিজেদের সমর্পণ করেন আল্লহর কাছে এবং শেষ রাসুলের প্রতি বিশ্বাস রেখে। শিয়াপন্থিদের বিশ্বাস শুধুমাত্র আল্লহ এবং তার রাসুলের প্রতি সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের বিশ্বাসের পরিধি আরো ব্যাপক। তাদের বিশ্বাস আল্লহ ছাড়াও পুরো আহ্‌লে বায়েতের উপর, অর্থাৎ রাসুল এবং তার কন্যা ফাতিমার পরিবারের উপর। আবুসুফিয়ান থেকে বিন মুয়াবিয়া, বিন এজিদ কর্তৃক যেভাবে আহলে বায়েতের প্রতি অন্যায় করেছেন, আহলে বায়েতের ত্যাগ ব্যতীত

---

43 শামসুল আবেদীন(২০১৬) । *স্মৃতি নিয়ে কারবালা*। মুর্শিদাবাদ: কাদোয়া। পৃষ্ঠা ৪৫

কোনো দিন ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতনা। কারবালাতে হোসেনের আত্মবলিদান আজও কঠোর হৃদয় কেও নাড়িয়ে দিয়ে যায়। এজিদ বাহিনীর বিপুল সৈন্যের সামনে ৭২ টি তরতাজা প্রানের বলিদানের কাহিনী আজও অমর হয়ে আছে। বলা যায় সেই ঘটনা থেকে শিয়াপন্থি ধর্ম পালনের পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়া এই কাহিনির সঙ্গে জন্ম নিয়েছে নানা আখ্যান। বাংলায় সবচেয়ে বিখ্যাত ইসলামিক আখ্যান হল মীর মোসারেফ হোসেনের *বিষাদ সিন্ধু* (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯১), এছাড়া হাসান-হোসেনের বীরত্ব ও আল্লহর পথে থেকে নিজেদের আত্মবলিদানের ঘটনার ওপর তৈরি হয়েছে নহা, মার্সিয়ার মত শোকগাথা। কারবালার ঘটনাকে বিষয় করে শুধু বাংলায় ইসলামী সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তা নয়, নহা, মার্সিয়া কেন্দ্রিক গাথা রচনা করে উর্দু সাহিত্যকে বিপুলতর সমৃদ্ধি দিয়েছেন মির আনিস, দাবিরের মত সাহিত্যিকেরা। হোসেন দৈহিক ভাবে হেরে যাওয়ার মধ্যেই ছিল, ইসলামের জয়। মহম্মদের হাতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা হলেও প্রাণ পেয়েছে হাসান হোসেনের ত্যাগের মধ্যে। তারা শত লাঞ্ছনা সহ্য করেও, একেরপর এক আপনজনকে নৃশংসভাবে শাহাদাত বরণ করতে দেখে এবং আহলেবায়েতের সব বংশপ্রদীপ নিভে যাওয়ার পরেও কেউ-ই এজিদের কাছে মাথা নত করেনি। এই মাথা নত না করে শহীদ হওয়াকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন, আলির পরিবার ও তার শিষ্যরা। সব কিছু হারিয়েও যে জয় লাভ করা যায় তা ফুটে উঠেছে সাহিত্যের এই ধারায়।

শিয়াপন্থিরা আহলেবায়াতের প্রতি নিজেদের সমর্পণ করেছেন তার কারণ বুঝতে ফিরে যেতে হবে রাসুলের মৃত্যুর সময়ে। শিয়াপন্থিদের ধর্মীয় মতাদর্শের রকমফের হয় কারবালার ঘটনার পর, কিন্তু আলির শিষ্যদের শিয়া হয়ে ওঠার বীজ লুকিয়ে ছিল রাসুলের মৃত্যুর পর ইসলামি বিশ্বের দায়িত্ব কার কাঁধে পড়বে তার উপর। মূলত মহম্মদ একজন মহান শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচারক, তথা ধর্ম বিষয়ক নেতা ছিলেন তবুও তাঁর হাতে মুসলিম আরবদের সমস্ত দায়িত্ব, শৃঙ্খলা, বিচার-ব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পরে এই বিশাল দায়িত্ব কে নেবে সেই নিয়ে প্রশ্ন ছিলোই, এবং নবির পরবর্তিতে খলিফার প্রয়োজন দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তিনি সবসময়ই এই দায়িত্ব আলিকে দিতে চেয়েছিলেন তা ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেও সরাসরি আলির নাম কখনো প্রকাশ করেননি। এই বিষয় রাসুলের সমস্ত সাহাবাদের অজানা ছিলনা। রাসুলের মৃত্যুর সময় যখন তাঁর পরিবার দাফনকার্যে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় অধিকার লাভের নেশায় একদল আবুবকরকে[৪৪] খলিফা হিসাবে

[44] মহম্মদের মৃত্যুর পরে একদল মুসলিমদের মনে এইরূপ ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হল যে রাসুলের পদ পূরণের জন্যে আলিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। কারণ একাধিক বার রাসুল আলির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। বিশেষত তিনি রাসুলের পিতৃব্যপুত্র, এছাড়া জ্ঞানে শৌর্যে বীর্যে ত্যাগে বংশমর্যাদায় মহত্ত্বে আলি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু রাসুলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ওমরের মত কোরায়েশ প্রধান

নির্বাচিত করলেন। এখানে এমন মতবাদ আছে যে, গণতান্ত্রিক মাধ্যমেই খলিফা নির্বাচন করা হয়। তার্কিক ভাবে বলা যায়, বহুবার স্বয়ং মহম্মদ তার জামাতাকে উত্তরাধিকার দিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করে গেলেও কেনো আবুবকর সঠিক সময়ের অপেক্ষা না করে ইসলামী বিশ্বের দায়িত্ব নিলেন। এই দায়িত্ব নেওয়া নিছকই ইসলামি আদর্শের বিস্তারের উদ্দ্যেশেই ছিল নাকি নিজেকে শক্তিশালী করার তাগিদ মাত্র। কেনোই বা তিনি মহম্মদের ইচ্ছাকে ধুলিসাৎ করে ইসলামি আদেশ, উপদেশ ভুলে রাসুলের মিমাংসা গ্রহণ করলেন না। বহু কষ্টে অর্জিত ইসলামের কথা ভুলে গিয়ে ব্যক্তিগত লালসা ও ব্যক্তি হিংসার অনুগত হয়ে ইসলামি দুনিয়ায় একটা বড় কালো দাগ অঙ্কিত করলেন রাসুলেরই কিছু অনুগামীরা। আলিকে নেতা বলে নিয়েও আবু বকরকে[৪৫] খলিফা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে প্রথম ভুল ও অন্যায় করলেন তারা। কারবালা শরীফের ঘটনা ঘটার কারণের প্রথম পদক্ষেপই ছিল আলিকে সর্বপ্রথম তার আধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আববকর সার্বভৌম ক্ষমতাবলে আলিকে বঞ্চিত করে ওমরকে খলিফা নিযুক্ত করতে ওসিয়াত করে যান। এর পর ওমর এমনভাবে নির্বাচক মন্ডলি তৈরি করেন যাতে আলি যথারীতি আবার বঞ্চিত হয়ে ওসমান খলিফা নির্বাচিত হন। স্বাধীনচেতা আলি তাঁর বিচার-বুদ্ধিকে কোনোরূপে শৃঙ্খলিত করতে রাজি ছিলেন না। ফলে উমাইয়া বংশের ষড়যন্ত্রে তাদের জ্ঞাতি ওসমানকেই খেলাফত প্রদান করা হল। রাসুলের উওরাধিকারকে এই শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানের অভিষেক শেষ পর্যন্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পক্ষে শর্তবিহীন অমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি যেই বংশের সদস্য ছিলেন যে বংশ সর্বদা হাশেমী[৪৬] বংশধরদের

সুযোগ্য মুসলিম খেলাফতের জন্যে আবু বকরকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করে তাকে নেতা হিসাবে ঘোষিত করলেন। তার দেখাদেখি অন্যান্য মুসিলমরা আবুবকরকেই নেতা হিসাবে মেনে নিলেন। সুন্নিপন্থি বা শিয়াপন্থিদের মতাদর্শকে তুলনা করা বড় কঠিন। মূলত আবুবকর কারো থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না। রাসুলের প্রধান সহচর বন্ধু ছিলেন। আলির মত রাসুলের সঙ্গে আত্মীয়তায় এবং বংশ সম্পর্কে অতখানি ঘনিষ্ঠ না হলেও রাসুলের সহধর্মিনী বিবি আয়েশার পিতা ছিলেন কুরায়েশ বংশীয় আবুবকর। সমস্ত সাহাবার মধ্যে বয়োঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন তিনি। রাসুলের পিড়ীত অবস্থায় তিনি সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

[45] হিসেবে তিনিও সুযোগ্যই ছিলেন । কিন্তু খলিফা নির্বাচন ছিলো একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত, এবং এতোটাই শীঘ্র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে রাসুলের দাফন কার্য শেষ হওয়ার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন ওমর বা আবুবকররা। রাসুলের পরিবারবর্গের সঙ্গে এ হেন গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাদের উপস্থিতি কাম্য মনে করেননি। -ইমাম হাসান হোসেন, রুহুল আমীন

[46] আসলে আরবের বুকে প্রাচীন কাল থেকে কোরায়েশ সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল, সেই কারণে মক্কার কাবাগৃহের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রনের ভার তাদের হাতেই ছিল। আরবের এই কাজটি সেই যুগে সর্বাপেক্ষা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়রূপে গণ্য হতো। কোরায়েশ প্রধান আবদে মান্নাফ যখন কাবা গৃহের অত্ত্বাবধানকারী ছিলেন, তখন দুর্ধর্ষ জেমস্ সম্প্রদায় মক্কানগর আক্রমন করে বসে। তাদের প্রতিহত করতে আবদে মান্নাফ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদে শামসকে প্রেরণ করেন, এবং তিনি শত্রু দমনে কিছুটা সক্ষমও হন। এরপর পুনরায় কনিষ্ঠ পুত্র হাসেমকে যুক্ত করেন, হাসেম যোগ্যতার সঙ্গে শিত্রু বাহিনীকে মক্কার সীমানা থেকে দূর করে দেন। হাসেমে যোগ্যতাবলে তাঁর পিতা সন্তুষ্ট হয়ে কাজের পুরষ্কার স্বরূপ মান্নাফের মৃত্যুর পর হাসেমকেই কাবার তত্ত্বাবধায়ক

প্রতি বদ্ধমূল শত্রুতা পোষণ করত। তাদের এই বিদ্বেষপূর্ণ ভাব থেকেই অনতিকাল পরেই জন্ম নিয়েছিল আলির শত্রুরা। যে শত্রুতার বশে পারস্ত হয়ে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। রাসুলের জীবদ্দশায় তাঁর প্রভুত ব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের সামনে এ সব বিশ্বাসঘাতকের দল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকেই স্বার্থের তাগিদে এবং মুসলমানদের পার্থিব বিজয় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে কল্যাণ বহন করে এনেছিল তার আংশিক ভাগীদার হওয়ার লোভে নামমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কোনোদিন ইসলামী গণতন্ত্রের প্রতি শত্রুতা থেকে বিরত থাকেনি। লম্পট, অবিবেকী নির্মম এবং অন্তরে পৌত্তলিক; তারা সাম্যের ধর্মের প্রতি বিরক্তি বোধ করত যে সরকারের প্রতি তারা আনুগত্য প্রকাশ করেছিল তাকে ধ্বংস করার জন্যে এবং যে সব লোকের উপর প্রজাতন্ত্র নির্ভর ছিল তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে উদ্যত হয়েছিল।

ওসমানের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে শকুনি যেমন শিকারের গন্ধ পায় তেমনই এই বিশ্বাসঘাতকের দল মদিনায় এসে জুটেছিল। তাঁর খেলাফত লাভ উমাইয়াদের সেই বিদ্বেষ প্রকাশের এবং সেই বদ্ধমূল লাম্পট্যের সংকেত ছিল যা ইসলাম জাহানের অন্তঃস্থলকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। সেই সঙ্গে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জীবনগুলি ধ্বংস করেছিল। বিশ্বস্ততা ক্রমশ পদদলিত হল।সব বিভাগের অধিকার উমাইয়াদের হাতে গেল। সেই সব লোককে পদাধিকার দেওয়া হল যারা চিরকাল ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছে। তাদের অনুকূলে সমস্ত ট্যাকশাল উজাড় হল।

প্রথম তিন খলিফার আমলে যারা রাসুলের কট্টর শত্রু ছিল তারা কলেমা পড়ে মুসলিম হল বটে, কিন্তু তাদের মনে ইসলামিক আদর্শের ছিটে ফোটাও প্রবেশ করেনি। তার মধ্যে আবু সুফিয়ান ও হিন্দার পুত্র মুয়াবিয়া উল্লেখযোগ্য। খলিফা ওমর উমাইয়া বংশের ছিলেন ফলে উমাইয়াদের ক্ষমতা লাভের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। উমাইয়াদের হৃদয়ে যে বিষ ছিলো তা উগরে দেবার সুযোগ আসতে থাকে। যার ফল স্বরূপ হয় সংঘটিত হয় কারবালার ঘটনা। তিন বার প্রত্যাখিত হওয়ার পরেও আলি তিন খলিফাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতে থাকেন শিশু ইসলামকে রক্ষা করার তাগিদে। এরপর ওসমান পদে আসীন হলে তার মন্ত্রী ছিলেন

হবেন বলে ঘোষনা করে যান। এই ঘোষণায় আবদে শামস্ ছোটো ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে ও শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে আবদে মান্নাফের মৃত্যুর পরে তার কনিষ্ঠ পুত্র হাসেম কাবার দেখাশোনা করার কাজে নিযুক্ত হন, তাঁর মৃত্যুর পরে আব্দুল মোতালিব এই দায়িত্বে আসেন। এই ভাবে উওরাত্তর হাসেমের বংশধরদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। আবদে শামসের বংশধরগণ ক্রমশ হাসেমীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এই শত্রুতা কালক্রমে হাসেমী সম্প্রদায়ের পরবর্তি বংশধর আলি ও তৎপুত্র হোসেনের সঙ্গে শমসের পরবর্তি বংশধর মুয়াবিয়া এবং তার পুত্র এজিদের হাত ধরে ভয়ংকর রূপে আত্মপ্রকাশ করে । যার ফল স্বরূপ আলি- ফতেমার সন্তানদের নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়। - আলি, কে(২০০৩) । *ইসলামের ইতিহাস।* ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো

উমাইয়া বংশের মারওয়ান, যে সবসময় মুয়াবিয়া সঙ্গে রাসুলের পরিবারকে ধ্বংস করার কুচক্রে লিপ্ত থাকতেন। বলাবাহুল্য ওমরের খেলাফতের পর তিনি মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করছিলেন। এরপর ওসমান খলিফা হলে তাঁর সারল্যের কারণে মারোয়ানের কুচক্রে পড়ে তিনি এমন কতগুলি কাজ করে ফেললেন, যার কারণে ইসলামী সাম্রাজ্যে নেমে আসে এক মহাদুর্যোগ। ওসমান খলিফা হওয়ার পরেই উমাইয়ারা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করে বসে। যার ফলে উমাইয়াদের হাতে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা। মারোয়ান ও মুয়াবিয়ার চক্রান্তে ওসমানের মৃত্যু সংঘটিত হল। দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে এমন নৈরাজ্যের মধ্যে আলি খিলাফত পেলেন সেই সঙ্গে শিয়া মতে প্রথম ইমামের পদ পেলেন। উমাইয়ারা ওসমান হত্যার বিচার চাইলে আলি দোষীকে শাস্তি দিতে অপারগ থাকেন। ফলত আলির বিরুদ্ধে চলে যান বহু উমাইয়ারা। আর উসমানের[৪৭] মুয়াবিয়ার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন ফলে মুয়াবিয়া সেই সুযোগে তার বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সক্ষম হয়। এরপর চলতে থাকে আলির বংশ ধ্বংস করার মিশন। বিষাক্ত ছুরির আঘাতে নামাজরত আলিকে হত্যা করেন মুয়াবিয়া প্রেরিত মুলজাম ৪০ হিজরির ২১ রমজান অর্থাৎ ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারি। আলির গত হওয়ার আল্পকাল পরেই হাসানকে তিনবার ষড়যন্ত্র করে বিষ পান করিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে মুয়াবিয়া, অবশেষে তৃতীয়বারে হলাহল পান করিয়ে তার অভিসন্ধি সফল হয় তৃতীয় স্ত্রী যায়েদার মধ্যমে, দ্বিতীয় ইমাম হাসানও ইহলোক ত্যাগ করেন সাতচল্লিশ বছর বয়সে ৪৯ হিজরির ২৮শে সফর তারিখে (৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ)। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র এজিদ সিংহাসনে বসেন। এজিদ সিংহাসনে বসার পর ইমাম হোসেনের কাছ থেকে বারবার আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা করতে থাকেন এজিদ। ইমাম হোসেন কোনোদিনই দামেস্কের অত্যাচারী শাসককে বাদশাহকে খলিফা[৪৮] বলে স্বীকার করেননি। বহু কালের জমানো আক্রোশ উগরে দেবার সুযোগ খুঁজছিলেন উমাইয়ারা দীর্ঘদিন থেকেই। আহলে বায়াতের শেষ প্রদীপ হোসেনের মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে শান্তিতে বসবাস

[47] হজরত ঊসমান ছিলেন উমাইয়া বংশের হলেও বংশীয় ও গোত্রীয় দ্বেষ- হিংসা ও বিরুদ্ধতার কলঙ্ক-কালিমা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন ও অগাধ বিত্তের জন্যে 'গণি' বলে অভিহিত হন। নম্র ও সচ্চরিত্রের জন্যে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি হজরত ওমরের পর খিলাফতে আসেন। তার খিলাফত চলেছিল ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি। উমাইয়াদের ষড়যন্ত্রে তাঁকে ৬৫৬খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুন (৩৫ হিজরির ১৮ই জিলহ্বজ) নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। আলি, কে(২০০৩) । *ইসলামের ইতিহাস*/ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো

[48] খলিফা হল একটি পদ। আরবের সর্বোচ্চ মুসলিম শাসক উপাধি।

করতে দেয়নি হোসেন পরিবারকে। মুয়াবিয়া প্রথম থেকেই ভেবেছিল যে জোর করে শক্তির অপচয় করে খলিফার নামে রাজদন্ড হাতে নিয়ে ইসলামে প্রভুত্ব করবে। কিন্তু বাদশাহের ক্ষমতায় আসীন থেকে ইসলামের বুনিয়াদকে নড়াতে পারেনি। অমানবিক শয়তানি চক্রান্তের কাছে সত্য মাথা নত করেনি। কারবালার ময়দানে হোসেন শির ছিন্ন করার আগে অবধিও তিনি তার সত্যের পথ থেকে সরে দাঁড়াননি। ইসলামকে নতুনভাবে বাঁচিয়ে রাখার কারিগরই হলেন আহলেবায়াত। যাইহোক কুফার বেশ কিছু সংখ্যক শিয়া মুসলিমদের তরফ থেকে হোসেনের কাছে চিঠি আসতে থাকে কুফাবাসীর নেতৃত্ব গ্রহনের জন্যে। কুফায় পৌঁছানোর আগে অবধি অনেকেই ইমাম হোসেনকে সতর্ক করেন না যাওয়ার জন্যে, কিন্তু কুফাবাসীকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তারঁ অনুপস্থিতিতে মদিনায় হোসেনের পরিবারবর্গ থাকতে রাজি হলেন না। তারঁ পরিবার ও কজন অনুসারীদের নিয়ে কুফা রওনা দিলেন। মরুভূমিতে চলার পথেই ইবনে যিয়াদের[৪৯] সৈন্য হোসেনের ছোট্ট কাফেলাকে[৫০] আক্রমন করতে থাকে। এই ভাবে মরুভূমির তপ্ত আবহাওয়ায় জ্বলতে থাকে, পিপাসায় কাতরাতে থাকে। ইবনে যিয়াদের থেকে হুকুমনামা এল কাফেলাকে কোথাও থামতে দেওয়া না হয়। ইমাম হোসেনের ঘোড়া জুলজানাহ এর ওপর সওয়ার হয়ে পথে পাড়ি দিয়েছিলেন। পূর্বের ভবিষ্যৎ বাণি অনুযায়ী তিনি জানতেন যে কারবালাতে তিনি শহীদ হতে চলেছেন। তিনি চলেছিলেন কুফা অধিবাসীদের স্থান পূরণ করতে তাদেরই আমন্ত্রণে। কিন্তু যিয়াদের কুমন্ত্রণায় তার পূনরায় হোসেনের বিরূদ্ধে অস্ত্র ধারন করেন। ৬১ হিজরির ৫ ও ৬ মহরমের দিন কারবালার উত্তপ্ত মরুভূমি কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। উত্তপ্ত হাওয়া ঝলসে দিচ্ছে তাবু গুলিকে। ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, অত্যাচারিত হোসেনের ছোটো শিশু কন্যা, পুত্র, স্ত্রীদের ঘিরে চলেছিল শত্রুদের নিষ্ঠুর উল্লাস। ৭ মহরম এজিদ লস্কর ফোরাত (ইউফ্রেট্স) নদী ঘিরে ফেলল এবং নির্দেশ দেওয়া হল যে হোসেনের তাবুতে যেন এক ফোটা জল না পৌছায়। ৯ই মহরম এজিদের সৈন্য দলের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ৭২ জন সৈন্য এই কাফেলাতে ছিলেন- ১৭ জন এবং অন্যান্য সাথী ছিলেন ৫৫ জন। এই ৭২ এর এক কাফেলার বিরূদ্ধে এজিদ ২২হাজার সৈন্য মোতায়েন করেন। ১০ মহরম আশুরার দিনে হোসেনের তাবুতে হাহাকার পড়ে গেল ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যন্ত্রণায়। সকলে শাহাদাত পাওয়ার জন্যে সকলে যুদ্ধের বেশ ধারন করলেন। ৭২ জনের দলকে সাজানো হল, ৩২ জন অশ্বারোহী ৪০ জন পদাতিক সৈন্য। একে একে শহীদ

[49] আবু সুফিয়ানের জারজ পুত্র

[50] কাফেলা অর্থাৎ ছোট দল বা গোষ্ঠী

হতে থাকলেন সাহাবিরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে। আব্বাস, ওয়াহাব, কাসিম, আকিল, এমনকি হোসেন পুত্র ১৮ মাসের শিশু আলি আসগারকে তির নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করেনি এজিদ বাহিনী। অন্তিম পর্যায়ে হোসেন সিমার নামক এক নরপিশাচের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। মাথা থেকে ধড় আলাদা করে দেওয়া হয়, তারপর সেই প্রাণহীন দেহ্ের ওপর ঘোড়া ছুটিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয় হোসেনের শরীরকে।

এজিদ বুঝেছিলেন মহম্মদের পরিবারের শেষ স্তম্ভকে সরিয়ে ফেলে তাদের শিরদাড়া ভেঙে দিয়েছেন। অসুস্থ পুত্র জয়নুল আবেদীন তাবুতেই ছিলো কিন্তু তাকেও শত্রু পক্ষ হত্যা করতে উদ্যত হলে হোসেনের বোন জয়নব বাধা দেন। এই জয়নুল আবেদীনের থেকে পরে ৮ ইমামের ধারা চলতে থাকে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকআ নারীদের হত্যা করা না হলেও তাদের বন্দি করে নিয়ে আসা হয় এজিদের দরবারে । এই বন্দিদশা কদিন চলেছিল তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছ, (নয় দিন, চল্লিশ দিন, নয় মাস) বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে দামাস্কাস থেকে মদিনার দিকে রওনা হন জয়নুল আবেদীন তার পরিবারের সঙ্গে। মদিনা পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে কারবালার ঘটনা সম্পর্কে অবগত মদিনা বাসী মাতম করতে থাকলেন। সেই দিন থেকে আজও মহরম মাসের দশ দিন মাতম করেন মুসলিমরা। কিন্তু মতাদর্শের ভিন্নতায় মাতমের ভঙ্গি আলাদা হয়ে পরিবেশিত হয়েছে। সুন্নি পন্থিরা রোজা রাখেন, নামাজ পড়ে প্রার্থণা করেন কারবালার শহীদদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু শিয়াপন্থিরা শুধু নামাজ বা রোজা পালনই করেন না বরং নহা মার্সিয়া, সালাম পাঠের মধ্যে দিয়ে মাতম করে শহীদের আত্মত্যাগের ঘটনাকে স্মরণ করেন।

হোসেন পরবর্তী শিয়া মতাদর্শের উত্থান ও তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস

মুর্শিদাবাদে যে শিয়াপন্থিরা আছেন তারা মূলত বারোপন্থি শিয়া মুসলিম। ১২ জন ইমামকে বিশ্বাস করে তারা। শিয়ারা খিলাফতে বিশ্বাসী নয়, তারা মানে আল্লহ কর্তৃক ইমাম মনোনীত হয়, তাদের জীবনযাত্রা বা ব্যবহৃত বাক্যবলী আল্লহের আদেশ উপদেশ কে নির্দেশ করে। আর ইমাম হওয়ার যোগ্যতা শুধু আহলেবায়াতের বংশোদ্ভূত পবিত্র আত্মাদেরই আছে। শিয়া মতাদর্শ অনুযায়ী খিলাফতকে তারা মান্যতা দেন রাষ্ট্রের স্বার্থে কিন্তু খিলাফত থেকে প্রাপ্ত কোনও উপদেশকে তারা গ্রাহ্য করেননা। তাদের বিশ্বাস প্রোথিত হয়ে ইমামেতের উপর, তাদের বিশ্বাস করে ইমাম স্বয়ং আল্লাহ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আসেন, যারা রাসুলের পরিবারেরই অংশ। রাসুলের মৃত্যুর পর যে যে ধর্মীয় মতবাদ বা মতাদর্শ তৈরি হয়েছে এবং তা নিয়ে যা যা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সব

কিছুর কেন্দ্রে আছে হজরত আলি, শিয়া সুন্নি বিভাজন হোক কিংবা কারবালার ঘটনা। সব কিছুর সূত্রপাত আলিকে কেন্দ্র করে। ইসলামের লড়াই সিংহাসন লাভের লড়াই নয়, ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে যারা প্রয়াস করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন রাসুল ও রাসুলের পরিবার। রাসুলের পর যার কাঁধে ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব পড়েছিল তাদের সকলকে হত্যা করা হয়েছে। তার মধ্যে কারবালার ইতিহাস সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য। ইসলামের জন্ম লগ্ন থেকে সকল যুদ্ধে সবক্ষেত্রেই অন্য খালিফাদের পরিবর্তে আলিই নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি তার বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে রাসুলকে এতটাই সন্তুষ্ট করেছিলেন যে, রাসুলের থেকে আলি 'জুলফিকার' তরবারি লাভ করেছিলেন। ছয় হিজরীতেও খেয়বারের যুদ্ধেও তিনি ইহুদীদের পরাজিত করেছিলেন। আলি ছিলেন সর্বশেষ খলিফা। তাঁর সময়েই ইসলামী খিলাফতে বিভক্ত হয় এবং গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। তিনি যখন খিলফতের দায়িত্ব গ্রহন করেন, তখন মুসলিম বিশ্বে অরাজকতা ও বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করেছিল। আবু বকরের আমলেও অনুরূপ গোলযোগ ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল। আবু বকরকে ইসলামত্যাগী এবং ইসলামের পারস্পারিক সংঘর্ষের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। সমগ্র মুসলিম জাতি এ অভিযানে আবু বকরের সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক ছিল। কিন্তু আলির দুর্ভাগ্য হল তার বিরূদ্ধে গোলযোগকারীরা কেবল মুসলমানই ছিলেন না, তালহা ও যুবাইরসহ অনেক সাহাবা এমনকি, রাসুলের পত্নী আয়েশাও আলির বিপক্ষে ছিলেন। নিঃসন্দেহে এ পরিস্থিতি আলির খিলফত রক্ষার পক্ষে প্রতিকূল ছিল। কিন্তু তিনি প্রতিকূলতার সামনে মাথা নত করেননি। অসীম সাহস নিয়ে তিনি গোলযোগ, অশান্তি ও বিদ্রোহের মোকাবিলা করেছেন। তবুও আলি ছিলেন তাঁর সময়ের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির শিকার। পরিস্থিতির প্রয়োজনে তাকে মাবিয়ার সঙ্গে খিলাফত ভাগ করে নিতে হয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণ ছিল মুসলমানদের বিদ্রোহ, বিভিন্ন দলের অসহযোগীতা, মাবিয়ার চাতুর্যপূর্ণ কূটনীতি ও আরবদের কৌম চেতনা। রাজকীয় ক্ষমতা ভোগে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিলনা। খিলাফত লাভের পর খলিফা হিসাবে স্বীয় দায়িত্ব পালনে তিনি কখনো অবহেলা প্রদর্শন করেন নি। ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আলিকে যদিও হত্যা করা হয়েছিল।

ইসলামাবলম্বী শিয়া বা সুন্নি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত এক হলেও তাদের কলেমা এক নয়, ইসলাম যে স্তম্ভ গুলি আছে তার মধ্যে কলেমা পাঠ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, শিয়াপন্থিরা আল্লাহ প্রেরিত রসুলে গুরুত্বকে স্বীকার করেন ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, আলিপুত্র হোসেনের হাতে ইসলাম নবজীবন লাভ করেছিল। শিয়া দর্শন বিচার করলে, তারা ধর্মীয় ভাবাবেগের গভীরতা আদর্শ নেতা হোসেন প্রেমেই লুকিয়ে

আছে, এর থেকে হোসেনের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির কারণ বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না। এর পূর্বেই আলোচিত হয়েছে ইসলামের মতাদর্শ গুলি নিয়ে, সেখানের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধন্তে আসা যায়, ইসলামের বিভাজন শুধু মাত্র রাজনৈতিক বিভাজন নয়, বিভাজনের সুত্রপাত রাজনীতি থেকে হলেও পরবর্তীতে ধর্মীয় ভাব সপৃক্ত হয়ে জন্ম নেয় আলি ও তার পুত্রদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবুবকর সার্বভৌম ক্ষমতাবলে আলিকে বঞ্চিত করে ওমরকে খলিফা নিযুক্ত করতে ওসিয়াত[৫১] করে যান। এর পর ওমর এমনভাবে নির্বাচক মন্ডলী তৈরি করেন যাতে আলি যথারীতি আবার বঞ্চিত হয়ে ওসমান খলিফা নির্বাচিত হন। স্বাধীনচেতা আলি তাঁর বিচার-বুদ্ধিকে কোনোরূপে শৃঙ্খলিত করতে রাজি ছিলেন না। ফলে উমাইয়া বংশের ষড়যন্ত্রে তাদের জ্ঞাতি ওসমানকেই খেলাফত প্রদান করা হল। রাসুলের উওরাধিকারকে এই শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানের অভিষেক শেষ পর্যন্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পক্ষে শর্তবিহীন অমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি যেই বংশের সদস্য ছিলেন যে বংশ সর্বদা হাশেমী[৫২] বংশধরদের প্রতি বদ্ধমূল শত্রুতা পোষণ করত। তাদের এই বিদ্বেষপূর্ণ ভাব থেকেই অনতিকাল পরেই জন্ম নিয়েছিল আলির শত্রুরা। যে শত্রুতার বশে পারস্ত হয়ে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। রাসুলের জীবদ্দশায় তাঁর প্রভূত ব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের সামনে এ সব বিশ্বাসঘাতকের দল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকেই স্বার্থের তাগিদে এবং মুসলমানদের পার্থিব বিজয় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে কল্যাণ বহন করে এনেছিল তার আংশিক ভাগীদার হওয়ার লোভে নামমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কোনোদিন ইসলামী গণতন্ত্রের প্রতি শত্রুতা থেকে বিরত থাকেনি। লম্পট, অবিবেকী নির্মম এবং অন্তরে পৌত্তলিক; তারা সাম্যের ধর্মের প্রতি বিরক্তি বোধ করত যে সরকারের প্রতি

---

[51]ওসিয়ত' শব্দের অর্থ উওরাধিকারী।

[52] আসলে আরবের বুকে প্রাচীন কাল থেকে কোরায়েশ সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল, সেই কারণে মক্কার কাবাগৃহের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রনের ভার তাদের হাতেই ছিল। আরবের এই কাজটি সেই যুগে সর্বাপেক্ষা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়রূপে গণ্য হতো। কোরায়েশ প্রধান আবদে মান্নাফ যখন কাবা গৃহের অত্ত্বাবধানকারী ছিলেন, তখন দুর্ধর্ষ জেমস্ সম্প্রদায় মক্কানগর আক্রমন করে বসে। তাদের প্রতিহত করতে আবদে মান্নাফ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদে শামসকে প্রেরণ করেন, এবং তিনি শত্রু দমনে কিছুটা সক্ষমও হন। এরপর পুনরায় কনিষ্ঠ পুত্র হাসেমকে যুক্ত করেন, হাসেম যোগ্যতার সঙ্গে শত্রুবাহিনীকে মক্কার সীমানা থেকে দূর করে দেন। হাসেমের যোগ্যতাবলে তাঁর পিতা সন্তুষ্ট হয়ে কাজের পুরষ্কার স্বরূপ মান্নাফের মৃত্যুর পর হাসেমকেই কাবার তত্ত্বাবধায়ক হবেন বলে ঘোষনা করে যান। এই ঘোষণায় আবদে শামস্ ছোটো ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে ও শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে আবদে মান্নাফের মৃত্যুর পরে তার কনিষ্ঠ পুত্র হাসেম কাবার দেখাশোনা করার কাজে নিযুক্ত হন, তাঁর মৃত্যুর পরে আব্দুল মোতালিব এই দায়িত্বে আসেন। এই ভাবে উওরাত্তর হাসেমের বংশধরদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। আবদে শাম্সের বংশধরগণ ক্রমশ হাসেমীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এই শত্রুতা কালক্রমে হাসেমী সম্প্রদায়ের পরবর্তি বংশধর আলি ও তৎপুত্র হোসেনের সঙ্গে,শামসের পরবর্তি বংশধর মুয়াবিয়া এবং তার পুত্র এজিদের হাত ধরে ভয়ংকর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যার ফল স্বরূপ আলি-ফতেমার সন্তানদের নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়।

তারা আনুগত্য প্রকাশ করেছিল তাকে ধ্বংস করার জন্যে এবং যে সব লোকের উপর প্রজাতন্ত্র নির্ভর ছিল তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে উদ্যত হয়েছিল।

ওসমানের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে শকুনি যেমন শিকারের গন্ধ পায় তেমনই এই বিশ্বাসঘাতকের দল মদিনায় এসে জুটেছিল। তাঁর খেলাফত লাভ উমাইয়াদের সেই বিদ্বেষ প্রকাশের এবং সেই বদ্ধমূল লাম্পট্যের সংকেত ছিল যা ইসলাম জাহানের অন্তঃস্থলকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। সেই সঙ্গে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জীবনগুলি ধ্বংস করেছিল। বিশ্বস্ততা ক্রমশ পদদলিত হল।সব বিভাগের অধিকার উমাইয়াদের হাতে গেল। সেই সব লোককে পদাধিকার দেওয়া হল যারা চিরকাল ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছে। তাদের অনুকূলে সমস্ত ট্যাকশাল উজাড় হল।

প্রথম তিন খলিফার আমলে যারা রাসুলের কট্টর শত্রু ছিল তারা কলেমা পড়ে মুসলিম হল বটে, কিন্তু তাদের মনে ইসলামিক আদর্শের ছিটেফোটাও প্রবেশ করেনি। তার মধ্যে আবু সুফিয়ান ও হিন্দার পুত্র মুয়াবিয়া উল্লেখযোগ্য। খলিফা ওমর উমাইয়া বংশের ছিলেন ফলে উমাইয়াদের ক্ষমতা লাভের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। উমাইয়াদের হৃদয়ে যে বিষ ছিলো তা উগরে দেবার সুযোগ আসতে থাকে। যার ফল স্বরূপ হয় সংঘটিত হয় কারবালার ঘটনা। তিন বার প্রত্যাখিত হওয়ার পরেও আলি তিন খলিফাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতে থাকেন শিশু ইসলামকে রক্ষা করার তাগিদে। এরপর ওসমান পদে আসীন হলে তার মন্ত্রী ছিলেন উমাইয়া বংশের মারওয়ান, যে সবসময় মুয়াবিয়া সঙ্গে রাসুলের পরিবারকে ধ্বংস করার কুচক্রে লিপ্ত ছিলেন। বলাবাহুল্য ওমরের খেলাফতের ওমর মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করছিলেন। ওসমানের সারল্যের সুযোগে এবং মারোয়ানের কুচক্রে পড়ে তিনি এমন কতগুলি কাজ করে ফেললেন, যার কারণে ইসলামী সাম্রাজ্যে নেমে আসে এক মহাদুর্যোগ।

ওসমান খলিফা হওয়ার পরেই উমাইয়ারা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করে বসে। যার ফলে উমাইয়াদের হাতে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা। মারোয়ান ও মুয়াবিয়ার চক্রান্তে ওসমানের মৃত্যু সংঘটিত হল। দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে এমন নৈরাজ্যের মধ্যে আলি খিলাফত পেলেন সেই সঙ্গে শিয়া মতে প্রথম ইমামের পদ পেলেন। উমাইয়ারা উসমান হত্যার বিচার চাইলে আলি দোষীকে শাস্তি দিতে অপারগ থাকেন। ফলত আলির বিরুদ্ধে চলে যান বহু উমাইয়ারা। আর উসমানের মুয়াবিয়ার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন ফলে মুয়াবিয়া সেই সুযোগে তার বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সক্ষম হয়। এরপর চলতে থাকে

আলির বংশ ধ্বংস করার মিশন। মুয়াবিয়া প্রেরিত মুলজাম ৪০ হিজরির ২১ রমজান অর্থাৎ ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি মাসে বিষাক্ত ছুরির আঘাতে নামাজরত আলিকে হত্যা করেন। আলির গত হওয়ার অল্পকাল পরেই হাসানকে তিনবার ষড়যন্ত্র করে বিষপান করিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে মুয়াবিয়া, অবশেষে তৃতীয়বারে বিষপান করিয়ে তার অভিসন্ধি সফল হয় তৃতীয় স্ত্রী যায়েদার মধ্যমে, দ্বিতীয় ইমাম হাসানও সাতচল্লিশ বছর বয়সে ৪৯ হিজরির ২৮শে সফর তারিখে (৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ) ইহলোক ত্যাগ করেন।

৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র এজিদ সিংহাসনে বসেন। এজিদ সিংহাসনে বসার পর ইমাম হোসেনের কাছ থেকে বারবার আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা করতে থাকেন এজিদ। ইমাম হোসেন কোনোদিনই দামেস্কের অত্যাচারী শাসককে বাদশাহকে খলিফা[৫৩] বলে স্বীকার করেননি। বহু কালের জমানো আক্রোশ উগরে দেবার সুযোগ খুঁজছিলেন উমাইয়ারা দীর্ঘদিন থেকেই। আহলে বায়াতের শেষ প্রদীপ হোসেনের মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে শান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি হোসেন পরিবারকে। মুয়াবিয়া প্রথম থেকেই ভেবেছিল যে জোর করে শক্তির অপচয় করে খলিফার নামে রাজদন্ড হাতে নিয়ে ইসলামে প্রভুত্ব করবে। কিন্তু বাদশাহের ক্ষমতায় আসীন থেকে ইসলামের বুনিয়াদকে নড়াতে পারেনি। অমানবিক শয়তানি চক্রান্তের কাছে সত্য মাথা নত করেনি। কারবালার ময়দানে হোসেন শির ছিন্ন করার আগে অবধিও তিনি তার সত্যের পথ থেকে সরে দাঁড়াননি। ইসলামকে নতুনভাবে বাঁচিয়ে রাখার কারিগরই হলেন আহলেবায়াত। যাইহোক কুফার বেশ কিছু সংখ্যক শিয়া মুসলিমদের তরফ থেকে হোসেনের কাছে চিঠি আসতে থাকে কুফাবাসীর নেতৃত্ব গ্রহনের জন্যে। কুফায় পৌঁছানোর আগে অবধি অনেকেই ইমাম হোসেনকে সতর্ক করেন না যাওয়ার জন্যে, কিন্তু কুফাবাসীকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তারঁ অনুপস্থিতিতে মদিনায় হোসেনের পরিবারবর্গ থাকতে রাজি হলেন না। তারঁ পরিবার ও কজন অনুসারীদের নিয়ে কুফা রওনা দিলেন। মরুভূমিতে চলার পথেই ইবনে যিয়াদের[৫৪] সৈন্য হোসেনের ছোট্ট কাফেলাকে[৫৫] আক্রমন করতে থাকে। এই ভাবে মরুভূমির তপ্ত আবহাওয়ায় জ্বলতে থাকে, পিপাসায় কাতরাতে থাকে। ইবনে যিয়াদের থেকে হুকুমনামা এল কাফেলাকে কোথাও থামতে দেওয়া না হয়। ইমাম হোসেনের ঘোড়া জুলজানাহ

[53] খলিফা হল একটি পদ। আরবের সর্বোচ্চ মুসলিম শাসক উপাধি।

[54] আবু সুফিয়ান পুত্র

[55] কাফেলা অর্থাৎ ছোট দল বা গোষ্ঠী

এর ওপর সওয়ার হয়ে পথে পাড়ি দিয়েছিলেন। পূর্বের ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী তিনি জানতেন যে কারবালাতে তিনি শহীদ হতে চলেছেন। তিনি কুফা চলেছিলেন সেখানের অধিবাসীদের স্থান পূরণ করতে তাদেরই আমন্ত্রণে। কিন্তু যিয়াদের কুমন্ত্রণায় তার পূনরায় হোসেনের বিরূদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ৬১ হিজরির ৫ ও ৬ মহরমের দিন কারবালার উত্তপ্ত মরুভূমি কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। উত্তপ্ত হাওয়াতে ঝলসে দিচ্ছে তাবুর মধ্যে থাকা মানুষ গুলিকে। ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, অত্যাচারিত হোসেনের ছোটো শিশু কন্যা, পুত্র, স্ত্রীদের ঘিরে চলেছিল শত্রুদের নিষ্ঠুর উল্লাস। ৭ মহরম এজিদ সৈন্য ফোরাত (ইউফ্রেট্স) নদী ঘিরে ফেলল এবং নির্দেশ দেওয়া হল যে হোসেনের তাবুতে যেন এক ফোঁটা জল না পৌছায়। ৯ই মহরম এজিদের সৈণ্য দলের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ৭২ জন সৈন্য এই কাফেলাতে ছিলেন ১৭ জন এবং অন্যান্য সঙ্গী ছিলেন ৫৫ জন। এই ৭২ এর এক কাফেলার বিরূদ্ধে এজিদ ২২ হাজার সৈন্য মোতায়েন করেন। ১০ মহরম আশুরার দিনে হোসেনের তাবুতে হাহাকার পড়ে গেল ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যন্ত্রণায়। সকলে শহীদ হওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেলেন। ৭২ জন সৈনিকের দলকে সাজানো হল, ৩২ জন অশ্বারোহী ৪০ জন পদাতিক। একে একে শহীদ হতে থাকলেন সাহাবিরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে। আব্বাস, ওয়াহাব, কাসিম, আকিল, এমনকি হোসেন পুত্র ১৮ মাসের শিশু আলি আসগারকে তির নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করেনি এজিদ বাহিনী। অন্তিম পর্যায়ে হোসেন সিমর্ নামক এক নরপিশাচের হাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। মাথা থেকে ধড় আলাদা করে দেওয়া হয়, তারপর সেই প্রাণহীন দেহে ঘোড়া ছুটিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হয়।

এজিদ বুঝেছিলেন মহম্মদের পরিবারের শেষ স্তম্ভকে সরিয়ে ফেলে তাদের শিরদাড়া ভেঙে দিয়েছেন। অসুস্থ পুত্র জয়নুল আবেদীন তাবুতেই ছিলো কিন্তু তাকেও শত্রু পক্ষ হত্যা করতে উদ্যত হলে হোসেনের বোন কুলসুম বাধা দেয়। এই জয়নুল আবেদীনের থেকে পরে ৮ ইমামের ধারা চলতে থাকে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকআ নারীদের হত্যা করা না হলেও তাদের বন্দি করে নিয়ে আসা হয় এজিদের দরবারে। এই বন্দিদশা কদিন চলেছিল তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে, (নয় দিন, চল্লিশ দিন, নয় মাস) বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে দামাস্কাস থেকে মদিনার দিকে রওনা হন জয়নুল আবেদীন তার পরিবারের সঙ্গে। মদিনা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কারবালার ঘটনা সম্পর্কে অবগত মদিনা বাসী মাতম করতে থাকলেন। সেই দিন থেকে আজও মহরম মাসের দশ দিন মাতম করেন মুসলিমরা। কিন্তু ভিন্ন মতাদর্শে মাতমের ভঙ্গি আলাদা। সুন্নি পন্থিরা রোজা রাখেন,

নামাজ পড়েন আলাদা ভাবে কারবালার শহীদদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু শিয়াপন্থিরা নামাজ বা রোজা পালনই করেন না বরং নহা মার্সিয়া, সালাম পাঠের মধ্যে দিয়ে শহীদের আত্মত্যাগের ঘটনাকে স্মরণ করেন।

কারবালার ঘটনা বা হাসান-হোসেন কাহিনি মুসলিম পণ্ডিতদের বক্তব্য, বিভিন্ন পুরানো ধর্মীয় বই, মুসলিম কবিদের হাসান-হোসেন কেন্দ্রিক কবিতা থেকে আমি কারবালার ঘটনা সম্পর্কে অনেককাল আগে থেকেই পরিচিত ছিলাম। কিন্তু কারবালার ঘটনার অন্তর্নিহিত অর্থ সেই ভাবে বোঝার চেষ্টা করিনি। ইরানীদের বিষয়ে কাজ করার সুবাদে হাসান-হোসেন কাহিনিকে আরোও ভালো ভাবে জানার সুযোগ হয়েছে। একজন মুসলিম (সুন্নি) হওয়া সত্ত্বেও আমার চারপাশের পরিবেশ ও নিজের বেড়ে ওঠার মধ্যে মৌলিক ধর্মীয় রীতি পালনের মধ্যে দিয়ে ইসলামকে বুঝেছি। ঈদ, রোজা, নামাজ এমন কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরে আমি ইসলামকে বুঝিনি। হাসান-হোসেন কাহিনি জানা থাকলেও কাহিনি হিসাবেই দেখেছি। গল্প উপন্যাস পড়ার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে কোনো চরিত্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে হঠাৎ যেমন হাসির ফোয়ারা নেমে এসেছে, তেমনই চরিত্র গুলির আবেগের সঙ্গে নিজের আবেগ এক হয়ে বুকে চিনচিন ব্যথা অনুভব করেছি। হাসান-হোসেনের কাহিনিও এমনটাই, হোসেনের প্রিয় কন্যা সখিনা যুদ্ধের শেষে মাঠে ছুটে গিয়ে তার পিতার ছিন্নভিন্ন মস্তকহীন শরীর জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে রাতের অন্ধকারে বুকফাটা কষ্ট নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। হোসানের বোন জয়নব সখিনাকে সেই রাতে তাবুতে না পেয়ে খুঁজে পায় পিতার বুকে মাথা রাখা ঘুমন্ত সখিনাকে এবং তারপরই সেই স্থান থেকে তাকে নিয়ে যায়। কিংবা হোসেন যখন ঘোড়সওয়ার হয়ে ছোট পুত্র আলি আসগারকে নিয়ে যখন জলপান করাতে নিয়ে যায় ফোরাত নদীর পাড়ে, তখন এজিদ বাহিনী দুধে শিশু আলি আসগারকেও ছাড়েনি তির নিক্ষেপ করতে। হোসেন ছিন্নশির বরচির (বল্লম) মাথার ফুটিয়ে যখন এজিদের দরবারে নিয়ে যায়, তখন হোসেনের পরিবার ও তার কিছু অনুসারীরা বন্দি অবস্থায় ছিল। এই কাহিনির সঙ্গে আমরা নিজেদের কতটা যুক্ত করতে পারবো জানিনা, কিন্তু প্রত্যেকটি টুকরো ঘটনা খুব কঠিন মনকেও নাড়া দিয়ে যায়। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান মুসলিম সমাজের গভীর যোগ আছে এই বিষয়টি আমাকে আগে কখনো ভাবিয়ে তোলেনি। মুর্শিদাবাদের মহরম পালন খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার পর বুঝতে পেরেছি সেই ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রভাব আজও কিভাবে বিশেষ করে মুসলিমদের ওপর প্রভাব ফেলছে।

জিলহজ্ব মাসের শেষ রাতের চাঁদ দেখার পর মহরমের মাস শুরু হয়ে যায়। তার পর থেকে দুই মাস আট দিন ধরে চলতে থাকে প্রতিদিন মাতমের পালা। ঘরে ঘরে মাতম করা হয়। কোথাও মজলিস কিংবা কোথাও বা মহিলা মজলিস। এই মজলিসের মূল বিষয় বস্তু রাসুল এবং তাঁর পরিবারের মাহাত্ম্যের বর্ণনা করে মহরম মাসে ঘটা সেই শোকের দিনকে তুলে ধরা। শিয়াপন্থিরা বারবার একজোট হয়ে আশুরার দিনকে মনে করে কারণ, আজকের ইসলাম বেঁচে আছে হাসান-হোসেনের আত্মত্যাগের জন্যে। তারা কোনোভাবেই এই বলিদান থেকে নিজেরদের অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনা। এই কারবালার ঘটনা যেমন আহলেবায়েতকে নষ্ট করে ফেলেছিল, তেমন জন্ম দিয়েছিল এক নতুন ইসলামকে, যে ইসলাম শিখেছিল ত্যাগের পথে হেঁটে কিভাবে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায়। দেখা যায় ছোটো শিশুরা ঝুলা নিয়ে মাতমকারীদের দলে পা মেলাচ্ছে। হোসেনের আঠারো মাসের পুত্রকে এজিদ তির নিক্ষেপ করে শহীদ করে, সেই ঘটনাকে স্মরণ করে ঝুলা অর্থাৎ দোলনাকে প্রতীকী রূপ দেওয়া হয়। আবার এই শিশুরা নকুলদানা পূর্ণ ছোটো থলে নিয়ে ফকির বেশে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছে তার বিনিময়ে বড়রা তাদের কিছু খুচরো পয়সা হাদিয়া দিচ্ছেন। নারীরা নানা রকম সরবত তৈরি করে বিলিয়ে দিচ্ছেন মাতমকারীদের মধ্যে। একটি শিশুকে ছোটো থেকেই স্বাদ পায় সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার অনাবিল আনন্দকে। জলের পিপাসায় পিপাসার্ত জল দেওয়ার মর্ম বুঝিয়ে দেওয়া হয় সমস্ত শিয়াপন্থি শিশুকে তাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। শিশুরা ফকির বেশে মিষ্টি খাবার দান করে বটে, তার পিছনেও আছে মহান উদ্দেশ্য, মহরমের মাতমকারীদের মিছিলে সবাই এই কামনা করতে থাকে, কারবালাতে হোসেন নিজের বলিদান দিয়েছিলেন যাতে কারো সামনে নবমুসলিমরা মাথা নত না করে আল্লাহ ছাড়া। সেই ঘটনাকে সামনে রেখে শিশুদের এই শিক্ষা দেওয়া হয় আল্লাহ এবং আহলেবায়াত ছাড়া যেন কারো সামনে মাথা নত না করতে হয়।

পরিবারের বয়োঃজ্যেষ্ঠ যারা আছেন তারা আলমে থাকা লালসুতো পরিবারের প্রত্যেকের হাতে বেঁধে দেন। লালসুতো সুরক্ষিত রাখবে সমস্ত শয়তানি শক্তির থেকে এই বিশ্বাসের সঙ্গে হাতে বাঁধা হয়। লালসুতো বিপত্তারিনী হিসাবে হিন্দু সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও ব্যবহার করে থাকেন। তবে হিন্দুধর্মের ইমেজটি জড়িত তাদের আইডলদের সঙ্গে, আর শিয়া ইমেজ জড়িত আলমের বা ত্যাগের সঙ্গে। আলম সেই ৭২ জন শহীদজন মনে করায় যারা ইসলামকে বাঁচানোর জন্যে ইসলামের নিশানকে অক্ষত রেখেছিল এজিদ বাহিনীর সামনে। আলম একটা ধারণা, যে ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয় মাশকিজা, ঝুলা, পাঞ্জেতানপাক, তাবুত প্রভৃতি বিষয়গুলি। আসলে এ

গুলি প্রতীকমাত্র। প্রতিটি প্রতীক আলাদা আলাদা ঘটনা বা কোনও শহীদী আত্মত্যাগকে স্মরণ করায়। যেমন মাশকিজা বা জলের কুঁজ কারবালার তপ্ত মরুতে থাকা সকল তৃষ্ণার্তদের প্রতীক। আলম গাজী আব্বাসকে স্মরণ করায়, যিনি ইসলামের নিশানকে কাঁধে বয়ে বেড়াতেন, মৃত্যুর সময়েও নিশানের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন হতে দেননি।

পাঞ্জেতান পাক হল রাসুলের পরিবারের ৫ জন প্রধান নেতা বা নেত্রী যাদের আদর্শে ইসলাম টিকে ছিলো, ১) রাসুল, ২) কন্যা ফাতিমা, ৩) জামাতা হজরত আলি, ৪) আলির দুই পুত্র ইমাম হাসান ও হোসেন- এদের নাম নিশানে খদিত থাকে। ঝুলা মনে করায় ছয়মাসের শিশু আলি আসগারের নৃশংস মৃত্যুর কাহিনীকে। আর তাবুত সকল শহীদদের পবিত্র মৃত দেহকে স্মরণ করে বানানো হয়, অনেকটা ফুল সজ্জিত কফিনের মত দেখতে হয় তাবুত গুলি। পথে বেরিয়ে মাতম করার সময় এই প্রতীকীগুলিকে সঙ্গে নিয়ে নহা পাঠের মাধ্যমে হোসেন প্রেমকে ব্যক্ত করা হয়। রাসুলের জীবদ্দশায় তিনি দারিদ্রতাকেই সাদরে গ্রহন করেছিলেন, পার্থিব লোভ-লালসা ত্যাগ করে। শহীদদের রক্ত ঝরানো দিনটি ও মহম্মদের দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে বেঁচে থেকে যে সততার উদাহরণ তৈরি করেছেন, লাল সুতো পরিধান তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মাত্র।

আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে রাসুলের পরিবারবর্গের আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়ে এবং কারবালার ঘটনার সঙ্গে স্বীয় আত্মাকে সফল ভাবে যুক্ত করার জন্যে বিভিন্ন রকম শোকগাথা গাওয়া হয়। কারবালার শহীদদের নামের তালিকাটি গুরুত্বপুর্ণ। কারবালার শহীদেরা হলেন –

১) যোহায়েব ইবনে হাসসাম, ২) সাআদ ইবনে হামদানী, ৩) ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ, ৪) বোরাইর ইবনে হামদানী, ৫) আমর ইবনে খালেদ, ৬) খালেদ ইবনে ওমর, ৭) আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ৮) আমর ইবনে আবদুল্লাহ, ৯) হাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, ১০) ওয়াক্কাস ইবনে মালেক, ১১) শারীহ ইবনে ওবায়েদ, ১২) মোসলেম ইবনে আবি-মারবাহ, ১৩) হেলাল ইবনে নাফে, ১৪) মোসলেম ইবনে আওজাহ, ১৫) কায়েস ইবনে মারবাহ, ১৬) হাশেম ইবনে ওতবাহ, ১৭) বাশীর ইবনে আমর, ১৮) নাঈম ইবনে আজলান, ১৯) যোহায়ের ইবনে কায়েস, ২০) আনাস ইবনে আসাদ, ২১) হাবিব ইবনে মোজাহের, ২২) কায়েস ইবনে রাবী, ২৩) আবদুল্লাহ ইবনে আরওয়াহ, ২৪) আব্দুর রহমান ইবনে আরওয়াহ, ২৫) হোর্‌রা বাস্‌রী, ২৬) শায়েস ইবনে আবদুল্লাহ, ২৭) কাসেদ ইবনে যোহায়ের, ২৮) কারদাদ ইবনে যোহায়ের, ২৯) কাতাবাহ ইবনে আকীক, ৩০) জরামা ইবনে মালেক, ৩১) জোবায়ের ইবনে মালেক, ৩২) ওমর ইবনে সীনাহ, ৩৩) ইয়াজিদ ইবনে শায়েছ,

৩৪) আবদুল্লাহ ইবনে সায়েস, ৩৫) আমেরাহ ইবনে মোসালেম, ৩৬) গজব ইবনে আমর, ৩৭) সালেম, ৩৮) সইফ ইবনে মালেক, ৩৯) জোহায়ের ইবনে বশীর, ৪০) বদর ইবনে মাশাল, ৪১) হাজ্জাজ ইবনে মারদাক, ৪২) মাসুদ ইবনে হাজ্জাজ, ৪৩) মাজমা ইবনে আবদুল্লাহ, ৪৪) আম্মার ইবনে হাসাস, ৪৫) হাসান ইবনে হারেস, ৪৬) জুনুব ইবনে হাজার, ৪৭) ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ, ৪৮) তাহের, ৪৯) জাবালা ইবনে আলি, ৫০) আসলাম ইবনে কাসীর, ৫১) জোহায়ের ইবনে সালিম, ৫২) কাসেম ইবনে হাবিব, ৫৩) আমন ইবনে জন্দুব, ৫৪) আবু তামাম, ৫৫) সালমান, ৫৬) কাব, ৫৭) আবওয়াহ, ৫৮) মাসয়াব, ৫৯) আলি ইবনে হোর, ৬০) হোর ইবনে ইয়াজিদ, ৬১) সাআদ ইবনে আবদুল্লাহ, ৬২) শুজাব, ৬৩) সাইয়িব ইবনে হারেস, ৬৪) মালেক ইবনে সারি। ৬৫) মোহাম্মদ ইবনে আনাস। ৬৬) মেকদাদ আনসারী। ৬৭) আমর ইবনে আবদুল্লাহ। ৬৮) হানজালা ইবনে আসাদ, ৬৯) আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ, ৭০) আম্মার ইবনে আবি সালমাহ, ৭১) আয়েশ ইবনে হাবিব, ৭২) আবদুল্লাহ ইবনে সায়েস আনসারী।

ভারতবর্ষে নহা চর্চার ইতিহাস

ইসলামিক শোকগাথার চর্চা ভারতে উর্দু সাহিত্যে ব্যাপকভাবে হয়েছে। শোকগাথার মূল বিষয়বস্তু হাসান হোসেন কাহিনিই, তথা কারবালার সঙ্গে যুক্ত চরিত্রদের নিয়ে এই গাথা গুলির বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছে। মহরমের আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি পালনের মধ্যে দিয়ে শিয়া-সুন্নি পার্থক্য খুব ভালোভাবে বোঝা গেলেও শোকগাথা রচনা কোনো মতাদর্শের ওপর টিকে নেই। সোজ, মারসিয়া, নহা আলাদা আলাদা করে যে সংরূপ তৈরি হয়েছে, সেই সংরূপ গুলি বিশ্লেষিত হলেও ইসলামিক আলাদা মতাদর্শের পরিচয় এখানে খোঁজা ভুল হবে। যদি বিষয় আসে ট্রাজিক কোনও ঘটনার ওপর, তবে কালক্রমে সেই ঘটনার রেষ অনেকাংশে ম্লান হয়ে যায়। মেমরি বা স্মৃতি মানুষ মানব আবেগ সম্বন্ধীয় হলেও, স্মৃতি সবসময় ইতিহাস হয়ে ওঠেনা এবং স্মৃতি সবসময় লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গেও যুক্ত হতে পারেনা কারবালার ঘটনা নিয়ে যখন কোনো কবি গাথা লেখেন তার সঙ্গে সংমিশ্রন ঘটে কবি নিজস্ব ভাবনা ও কল্পনার। কারবালাও স্মৃতিকথার মধ্যেই পড়ে, এই ঘটনা অসীমতা এতই বেশী যে দীর্ঘ শতাব্দী পেরিয়ে আসার পরেও, এই হৃদয় বিদারক ঘটনা রেষ আজও বয়ে চলেছে সমগ্র পৃথিবীতে। কারবালার বহুমুখী প্রতীকী ভাবনা বিলাপকারী ও কবিদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। কারবালা কাহিনি মূলীভূত হয়েছে মিস্‌টিসিজমবাদ বা অতিন্দ্রিয়বাদের মধ্যে, যখন দক্ষিণ এশিয়াতে মুসলিম

সাধকেরা ভারতের মাটিতে পা রেখেছেন তাদের হাত ধরে ইসলামী সাহিত্য ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

ওহাদাত-আল-ওয়াজুদ বা সর্বেশ্বরবাদ মতবাদটি তাত্ত্বিকভাবে বিকশিত ইবনে আরাবির দ্বারা হলেও এই মতবাদ মূলীভূত হয় ভারতের মাটিতে। পারাসী অদ্বৈতবাদী কবি মনসুর হল্লাজের (৮৫৮-৯২২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিধ্বনি 'আমিই সত্য', প্রতিধ্বনি তোলার কারণে তাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয়েছিল, তিনি আলাদা ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এই ধারণাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং ঈশ্বর সর্বময়, অর্থাৎ ঈশ্বর সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যেই বর্তমান, তাই নিজের মানব অস্তিত্বের উপরে উঠে তিনি নিজের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করেছিলেন বলে নিজেকেই সত্য বা ঈশ্বর বলে দাবি তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন সুফিবাদের উপদেষ্টা। সাত বা আট শতকের মাঝামাঝির দিকে তার ধারণাকে ভ্রান্ত বলে মনে করা হলেও পরে তাঁরে ভাবনার মর্মার্থ নিয়ে বহু সুফিসাধক চর্চা করেছেন। সুফিবাদীদের বিষয়ের সঙ্গে পরে যুক্ত হয়েছে কারবালার বিষয়। কারবালার স্মৃতিচারণ সভায় রাসুলের পরিবার আদর্শের পরীক্ষা ও কঠোর যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গেছেন তা নিয়ে চর্চা হয়। এর গূঢ় অর্থ বিশ্লেষণে আধ্যাত্মিক পরিণতির দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উঠে এসেছে এই বিষয়টি থেকে। যারা কারবালাতে শহীদ হয়েছেন তাদের এই আত্মত্যাগের মূল উদ্দেশ্য হল পার্থিব লোভ লালসা ত্যাগ করে অনন্ত সুখের ঠিকানা জান্নাত বা স্বর্গে পৌঁছানো। যেখানে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হবে। শহীদদের সম্মান দেওয়ার জন্যে রাসুল ও তার পরিবার আল্লহের কাছে সুপারিশ করবে। এই কারণে শহীদদের মর্যাদা এতটাই বেশী। এজিদের সেনাপতি হোর নামক চরিত্রটির কথা এখানে উল্লেক করা যেতে পারে। মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনে জান্নাত লাভ করা ইসলামে বিশ্বাসী মুসলিমদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এজিদ দামেস্কের খুব শক্তিধর নায়ক হলেও তার স্মরণে যখন জান্নাত লাভের খেয়াল জেগে ওঠে তখনই এজিদের পক্ষ ত্যাগ করে হোসেনের জন্যে শহীদ হয়ে যান । মহম্মদ ও তার পরিবারের হাত ধরেই যেহেতু জান্নাত লাভ সম্ভব বলে মহম্মদের অনুসারীরা মনে করেন সেই কারণেই রাসুলের পরিবারের সঙ্গে বিরোধীতা করা শির্খ বা মহাপাপের সমান, তাই মৃত্যু পরবর্তী জীবনে জান্নাত লাভের ভাবনায় ভাবিত হয়ে অন্যায় কাজ থেকে নিজেরদের বিরত রাখেন। হোর চরিত্রটি সকল শহীদদের মধ্যে স্মরণীয়। 'হোর' শব্দের অর্থ 'মুক্ত', তিনি যখন পরকালের চিন্তার ও হোসেনের বিরোধিতা করার অন্যায়ে আত্মদংশনে ভুগছেন, হোসেন তার পূর্বকৃত সমস্ত পাপকাজ থেকে মুক্তি দিয়ে জীবদ্দশায়ই জান্নাত ঘোষণা করে দেন। খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি

হোসেনের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করে বলেছেন 'হাক্কা কে বিনা-এ লা ইলাহা আস্‌ত হোসেন' অর্থাৎ ইহাই সত্য যে লা ইলাহার ভিত্তিই হল হোসেন।

দক্ষিণ এশিয়াতে কারবালা কেন্দ্রিক রওজা-আল-শুহাদা বা শহীদদের বেহেস্তি বাগান এই পাঠটির এখনও অবধি সবচেয়ে জনপ্রিয় পাঠ্য। ইরানী শিয়া সাধক হোসেন ওয়ায়িজ কাশিফির লেখাগুলি গানের আকারে বা কবিতাকারে ইরানের রওজাগুলিতে পাঠ করা হয়। দক্ষিণ এশিয়াতে সতেরো-আঠেরো শতকের দিকে যখন মুসলিম সাধকদের মধ্যে মিস্‌টিসিজম বা অতীন্দ্রিয়বাদের ঐতিহ্য গড়ে উঠছে তখন উত্তর ভারতে কারবালা কেন্দ্রিক উর্দু সাহিত্য যথেষ্ঠ সমৃদ্ধ। এর কারণ আঠেরো শতকে পৌঁছে মোঘল সাম্রাজের শাসন প্রায় অনেকটা অস্তমিত। ষোড়শ শতকে আকবরের আমলে তৈরি ১২টি সুবার মধ্যে একটি সুবা ছিল অযোধ্যা বা আওয়াধ। ১৭২২ সালের দিকে এই প্রদেশের সুবেদার নবাব ছিলেন সাদাত আলি খান[৫৬]। তিনি জন্মগত ভাবে পারসী ছিলেন, তিনি অযোধ্যার নাম বদলে আওয়াধ করে, সেখান থেকে লখনউ তে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তার সময় থেকেই লখনউতে গড়ে মার্সিয়া বা নহা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। উর্দু সাহিত্যে কাওয়ালি, গজল, কাসিদে সায়েরী, মার্সিয়া বা নহা চর্চার বিরাট স্থান রয়েছে। ইসলামিক ভাবনার ফসল নহা ,মার্সিয়ারর মত সাহিত্যচর্চা থেকে উর্দু সাহিত্য সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। মির বাবর আনিস ও মির্জা দাবির উর্দু সাহিত্যের সবচেয়ে দুই বিখ্যাত মার্সিয়া লেখক। আনিস এবং দাবিরের লেখায় আওয়াধের সংস্কৃতির প্রভাব পাওয়া যায়। মার্সিয়ার মধ্যে নিজস্ব ভাষার ঐশ্বর্যে কারবালার স্মৃতি কথা ফুটিয়ে তুলেছেন এই মার্সিয়া লেখকেরা। উচ্চ কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কারবালার ট্রাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নতুন রচনাশৈলী গড়ে তুলেছেন এই লেখকদ্বয়। উত্তর ভারত থেকে মূলত নহা বা মার্সিয়া চর্চা শুরু হয়। সেখান থেকেই ভারতীয় শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমদের মধ্যে মার্সিয়া বা নহা সাহিত্য চর্চা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

কাসিফ্‌ির লেখা বইটি রওজা-আল-সুহাদা বইটি নবি কেন্দ্রিক আলোচনা হলেও, মূলত আলোকপাত করা হয়েছে কারবালার ঘটনার উপর। বিচিত্রমুখী ঘটনাকে তিনি কখনো গদ্য কিংবা কখনো শ্লোকাকারে রচনা করেছেন। প্রথমে তার শ্লোকগুলি জনপ্রিয়তা পেলে পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে প্রবেশ করে। ইরানে

[56] সাদাত আলি খানের পিতা ছিলেন মহম্মদ নাসির। ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি হিসাবে মহম্মদ নাসির মারাঠাদের বিরূদ্ধে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। ২৫ বছর বয়সে সাদাত হোসেন তার পিতার সহযোগিতা করে বীরত্বের পরিচয় দেন। মোঘল সম্রাটের প্রতি তার একনিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয়ে খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন– Akther Siddique, Hameed History of Awadh(Oudh) a princely state of India. https://www.utsavpedia.com/fashion-cults/nawabs-of-awadh/

রওজাখানি[৫৭] গুলিতে মহরমের দিনে কাসিফির লেখা পাঠ করা ঐতিহ্যের মধ্যে প্রবেশিত হয়েছে। ধর্মীয় প্রসঙ্গ হিসেবে গুরুত্ব লাভ করায় রওজা- আল-সুহাদা ধর্মীয় পাঠে পরিণত হয়েছে। কাসিফির লেখা অনেকটা স্বাধীনতা দিবসে দেশপ্রেমের গান শোনার মত। ইরানীরা যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তারা তাদের সংস্কৃতিকে বয়ে নিয়ে আসে। রওজা-আল-সুহাদা ফারসি ভাষায় হওয়ার কারনে ইরান এবং উপমহাদেশ গুলিতে ব্যাপকভাবে পাঠ করা হয়। কাশিফির লেখা চিত্র শিল্পে, সাহিত্যে গভীর ভাবে প্রভাব ফেলে। ভিন্ন ভিন্ন genre তৈরি হয়েছে কাশিফির লেখা থেকে। ষোড়শ শতকের ইসলামীয় সংস্কৃতির অবদান অনস্বীকার্য। এই সময় ইসলামিক সৃজনশীল সৃষ্টি গুলি, যেমন চিত্র শিল্প, সাহিত্যক্ষেত্র অত্যন্ত মাত্রায় সমৃদ্ধ হয়। এই সময় বিশিষ্ট তুর্কি কবি মেহমাদ সুলায়মান ফজ্‌লি কারবালার কাহিনিকে হাদিকাত-সুহাদা বা রহমতের বাগান নামে কবিতার আকারে প্রকাশ করেন। তিনি চেয়েছিলেন তুর্কিরা যেন কারবালার বিবৃতিমূলক সাহিত্যস্বাদ থেকে বঞ্চিত না হন। এইভাবেই দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়াতে কারবালাকেন্দ্রিক সাহিত্যধারা বা চিত্রধারা ছড়িয়ে পড়ে যা পরে নানাভাবে সীমানা পেরিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ।

ইসলামীয় কারবালা কেন্দ্রিক সাহিত্যের ধারা ভারতবর্ষে শাসক গোষ্ঠিদের সংস্কৃতি থেকে উঠে এসেছে। হায়াদ্রাবাদে ২৫ শতাংশ শিয়াপন্থিদের বসবাস, সেখানে গোলকুন্ডার কুতুবশাহি রাজবংশ, আসাফজাহি থেকে নহা ও মার্সিয়া সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। মহরম কেন্দ্রিক যে সাহিত্য সংরূপ গড়ে উঠেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখেছে করেছে লখনউ-এর আওয়াধ রাজবংশ। মির্জা আনিস এবং দাবির মত কবিরা আওয়াধি সংস্কৃতি থেকে শোকগাথা লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন।

শিয়াপন্থিরা আল্লাহ, রাসুল ও রাসুলের পরিবার, ৮ জন ইমাম, সর্বমোট ১৪ মাসুমিনের সঙ্গেও ৭২ জন শহিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মহরমের মূলত শোকানুষ্ঠান। শোকেসভায় সমাবেত মানুষের বিলাপ সমর্পিত হয় ৭২ জন শহীদের প্রতি। মহরমের সময় প্রত্যেক শিয়াপন্থিরা সমবেত হয়ে এমন ভাবে বিলাপ করেন যেন তারা কারবালার শহীদদের যন্ত্রণা স্বীয় শরীরে অনুভব করছেন । তবে বিলাপ করা এই সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য নয়। রাসুল মহম্মদ ও তার পরিবারবর্গ যে আদর্শের মধ্যে দিয়ে ইসলামকে জীবিত রেখেছিলেন সেই আদর্শ যেন নিজের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন সেই শিক্ষা প্রদান করা হয় সভা বা মজলিশে। স্মরণ

[57] রওজা শব্দের অর্থ যেখানে দাফন করা হয়। আধ্যাত্মিক ভাবে যারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় , তাদের কবর স্থানকে রওজা বলা হয়। হাসান হোসেন উদ্দেশ্যে রওজা তৈরি হয়েছে , মহরমে সেখানে কারবালার নৃশংসতাকে স্মরণে রেখে মতম বা বিলাপ করা করা হয় ।

বিলাপের মধ্যে দিয়ে করার কারণ নিয়ে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, এর কারণ হিসেবে শিয়াপন্থিরা যে প্রচলিত মতামত দেন তা হল – রাসুল এবং তার পরিবারবর্গ যতদিন জীবিত ছিলেন দারিদ্রতা ও লাঞ্ছনা ভোগের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করেছেন। কারণ লালসা মুক্ত পার্থিব জীবনের শিক্ষা দান করতে, শিক্ষাগুরুর স্বীয় চরিত্রটি পার্থিব মোহহীনতার প্রত্যক্ষ উদাহরণ হিসেবে অধিষ্ঠিত হতে হয়। এই জন্যেই রাসুল ও তার পরিবার দারিদ্রতাকে কখনো দুর্ভাগ্য হিসাবে মানেননি। বরং দারিদ্রতার মধ্যে থেকে নিজের আদর্শের উপর অবিচল থেকে যিনি কল্যাণ বয়ে আনেন তিনি মানবকল্যানকারী সাধক। ইসলাম বিকশিত হয়েছে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে, অগণিত শহিদের আত্মবলিদানের ফল বর্তমানের ইসলাম। যাদের ত্যাগের জন্যে ইসলাম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের ত্যাগকে স্মরণ করার জন্য বিলাপ করাই উপযুক্ত মাধ্যম। নহা সোজ বা মার্সিয়া বিলাপের সুরে লেখা হয়েছে। মুল বিষয়বস্তু কারবালা হলেও উপস্থাপনার মধ্যে সুক্ষ এবং গভীর পার্থক্য আছে। ভারতবর্ষে যেখানে শিয়া সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সেখানে নহা ও মার্সিয়ার মত কবিতার জন্ম হয়েছে।

ভারতের আওয়াধের শাসক বুরহানুল-মুলকের (সাফাবিদ রাজবংশ: ১৭৩৯) সময়ে মির্জা আনিস ও দাবিরের হাতে বিশুদ্ধ ইসলামীয় সাহিত্য ধারা গড়ে ওঠে। এই সময়ে ভারতে সম্ভ্রান্ত ইরানীদের আগমন ঘটতে থাকে বিভিন্ন কাজের সুবাদে। বুরহানুল-মুলক নিজে একজন ইরানী ছিলেন, অভিজাত ইরানীদের তিনি সাদরে গ্রহন করেন ইরানীয় সংস্কৃতিকে আওয়াধে আরো সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তোলার কাজে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। ইরানীদের সংস্কৃতিতে মিশে গিয়ে আনিস ও দাবির নবাবের পৃষ্ঠপোষোকতা লাভ করেছিলেন। মুর্শিদাবাদেও এই শোকগাথার ধারা আজকের নয়, নবাবী শাসন শুরু হওয়ার সময় থেকে আজও মহরমের সময়ে শোকগাথা রচনা ও গাওয়ার ধারা অব্যহত রয়েছে। মুর্শিদবাদে নহা বা মার্সিয়ার প্রভূত সম্ভার হাজারদুয়ারীর গ্রন্থালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে পুরোনো কবিতা ও গাথা গুলিকে আর পুস্তককারে প্রকাশ করা হয়নি, এই কারনে পুরোনো গাথা গুলি অনেকাংশে হারিয়ে গেছে। তবে নতুন কবিরা কারবালা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেন। সেগুলিকে সুর বসিয়ে বিভিন্ন মজলিশে পাঠ করা হয়।

মুর্শিদাবাদে তিন শ্রেণির শিয়াপন্থিদের বসবাস আছে, নবাব বংশীয় শিয়া[৫৮], স্থানীয় শিয়া[৫৯], ইরানী শিয়া। বর্তমানে প্রত্যেক শিয়াপন্থিরা নামায, রোজা পালনের সঙ্গে মহরমের সময়ের শোকসভার আয়োজন করেন। ঘরোয়া ভাবেও দিনের যে কোনো সময়ে শোকপালন করা হয় নহা পাঠের মধ্যে দিয়ে, কারণ নহা আকারে ছোটো হওয়ার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নহা পাঠের ব্যাপকতা হয়েছে। দীর্ঘকালীন মজলিশ যদিও মার্সিয়া পাঠ করা হয়।

নহা ও তার পরিচয়

উর্দু কবিতা চর্চা শুরু করার পূর্বে প্রাথমিক ভাবে কিছু শব্দের সঙ্গে পরিচয় হওয়া আবশ্যিক। বোঝার সুবিধার্থে সেই শব্দ গুলির শব্দার্থ নিম্নে উল্লিখিত হল –

ক) বান্‌ধ- স্তাবক বা দুইএর বেশী পংক্তির স্তাবককেও বান্‌ধ বলে। তবে দুই পংক্তির স্তাবককে বান্‌ধ বলা যাবেনা।

খ) মাত্‌লা- নহা'র প্রথম স্তাবকঅকে মাতলা বলা হয়।

গ) মাক্‌তা- কবিতার শেষ পংক্তিতে যেখানে কবি নিজের সম্পর্কে বলেন।

ঘ)তাকাল্লুস- কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কবি যে ছদ্মনামের (Penname) ব্যবহার করেন।

ঙ) শের- দুই পংক্তির স্তাবক।

চ) মুসাল্লাস- তিন পংক্তির স্তাবক।

ছ) রাবা বা মুরাব্বা- চার পংক্তির স্তাবক।

জ) মুখাম্মাস- পাঁচ পংক্তির স্তাবক।

ঝ) মুসাদ্দাস- ছয় পংক্তির স্তাবক।

ঞ) মাতমী- যারা মাতম করেন।

---

[58] বর্তমানের যারা নিজেদের নবাব বংশীয় বলে দাবি করছেন প্রত্যেকেই মির্জাফরের বংশধর। বর্তমানে মির্জাফরের বংশধর হিসেবে যিনি নবাব পদে অধিষ্ঠিত তিনি হলেন সায়েদ রেজা আলি মির্জা।

[59] স্থানীয় শিয়া যারা আছেন তাদের ধর্মীয় আচার পদ্ধতিতে বেশ কিছু পার্থক্য ধরা পড়ে নবাবীদের ধর্ম পালনের থেকে। আর স্থানীয় শিয়া পরিবার যারা আছেন, তারা মুর্শিদকুলির সময়ে (১৬৬৫ সাল) এসেছিলেন, পরে পাকাপাকিভাবে রয়ে যান।- ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার। রাজা আলি মির্জা। ভি.আই.পি.গেট মুর্শিদাবাদ।

ট) শামেঈন- শ্রোতা।

ঠ) নহাখান- যিনি নহা বা মার্সিয়া পড়েন, নহা মার্সিয়ার ছোটো সংকলন।

ড) সোজখান- যিনি সোজ পড়েন।

ঢ) শায়ের- কবি।

ইসলামী শোকগাথা বা বিষাদ সংগীত গুলি লেখা হয়েছে রাসুল ও তার পরিবারকে কেন্দ্র করে। কারবালার শহীদ কেন্দ্রিক আরও একাধিক শোকগাঁথা রচিত হয়েছে তার মধ্যে নহা সালাম, সোজ, মার্সিয়া এগুলির মধ্যে অন্যতম। বিষয়গত ভাবে এদের একে অপরের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই। তবে মহরম কেন্দ্রিক উৎসবে এই বিলাপগাথা গুলি গাওয়া হয়ে থাকে। উপস্থাপনার ভিন্নতা থেকে আলাদা করে নেওয়া হয় এই শোকগাথা গুলিকে। যেমন মার্সিয়া আরবি 'রাসা' শব্দ থেকে এসেছে। মার্সিয়া কবিতাটির দেহ অনেক দীর্ঘ ও কাব্যধর্মী হয়। মার্সিয়াকে নাট্যকবিতার আঙ্গিকেও পরিবেশন করা হয়। সাধারণত পথ চলতি মাতমের সময়ে বা মজলিশে, ঘরোয়া বিলাপ করা হলে মার্সিয়ার থেকে নহা বেশী ব্যবহৃত হয়। মার্সিয়াতে একটি গোটা কাহিনিকে পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়, চরিত্র গুলির মধ্যে উক্তি প্রত্যুক্তিও চলে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়, তবে সব কবিতার মূল উদ্দেশ্য থাকে বিলাপ করা, রাসুলের পরিবারবর্গের মর্যাদাকে মহামান্বিত করা। মার্সিয়া সাধারণত 'মুসাদ্দাস' ছন্দে লেখা হয়, অর্থাৎ মার্সিয়াতে একটি স্তাবক বা 'বান্ধ' ছয় লাইনের হয়ে থাকে। প্রথম চার ও শেষ দুই পংক্তির অন্ত্যমিল রেখে মার্সিয়ার ছন্দ রচিত হয় (কককক, খখ)। ক্লাসিক্যাল সুর বসিয়ে পড়া হয় মার্সিয়া গুলি। মার্সিয়ার ব্যবহৃত রাগ গুলি হল- মলকাস, ভৈরবী, আসাবরী, দরবারী, ইমন, ভিমপলাশী ইত্যাদি।

ক) সালাম: সালামের বিষয় নহা বা মার্সিয়ার থেকে আলাদা নয়, তবে সালাম কখনো স্বতন্ত্র ভাবে পাঠ করা হয়না। নহা বা মার্সিয়ার দ্বারা বিলাপ শুরু করার পূর্বে সালাম পাঠ করা হয়। সালাম অনেকটা গৌরচন্দ্রিকার মত, হাসান-হুসেন ও রাসুলের স্তুতি করে তবে বিলাপ শুরু করা হয়। সালামের মধ্যে মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রদান করেন কবি। দৃষ্টান্ত –

"এক হি নুর সে হে নবি অওর আলি

ইয়ে আবতাক মুসলমা নে সামঝা নেহি

ইনকে সাথ মে জান্নাত মুসলমানো হাল্লে মুশকিল কো পেহেচান লো"

তিন লাইনের এই সালামে কবি সকল মুসলমানদের বলেছেন রাসুল ও আলির সাহায্য ব্যতীত জান্নাত লাভ সম্ভব নয়।

সালামের স্তাবক বা বান্ধ বিভাজন দুই, তিন, চার, পাঁচ লাইনের হয়ে থাকে। যদি মুসাল্লাস ছন্দে কবিতাটি হয় তবে এর গঠন হয়- ককখ। রাবা ছন্দে হলে কগ, খঘ; বা কঘ, খগ এমন হয়ে থাকে, মুসাদ্দাস ছন্দে হলে কক, খখ, গ- এমন ভাবে কবিতার দেহ তৈরি হতে পারে। আসলে কবি এই পংক্তির মধ্যে শব্দ ভাঙেন, গড়েন। শব্দ তৈরি করে অন্ত্যমিল বসিয়ে কবি নিজে স্বাধীনভাবে সৃজন করতে থাকেন।

দুই পংক্তির শেরের দৃষ্টান্ত-

"কারতি থি বায়া রোকার মজলুম সাকিনা
হাম লুট গেয়ে পারদেশ মে অ্যায় শাহে মাদিনা।"

তিন পংক্তির মুসাল্লাসের দৃষ্টান্ত –"

"হাম লোগোকে খ্যায়মোমে ইয়াগা শোর বাপা হে ক
ন্যাজা আলি আকবরকে কালিজে মে গাড়া হে ক
হামকো বেহেন নাম লেকে পুকারেগি কাভি না" খ

পাঁচ পংক্তির মুখাম্মাসের দৃষ্টান্ত –

"আল্লাহ কে জো শাহে ইবন-এ-মোর্তোজা ক
কাপতি থি দেখকার জিঙ্কো ক্বাজা ক
লাব পে থি নারায়ে হাক্ব সাদ মারহাওয়া খ
গুঞ্জ উঠী কারবালা মে ইয়ে সাদা খ
উনসে লাড়নে জো গেয়ে মার জায়েগা" গ

খ) সোজ: সোজ শব্দের অর্থ আফসোসকারী বা বিলাপকারী। সোজের মূল উদ্দেশ্য বিলাপ করা কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে ছোট করে ধর্মীয় বার্তা দিয়ে থাকেন সকল মুসলিমদের উদ্দেশ্যে। সোজ সাধারণত চার পংক্তির কবিতা বা রাবা ছন্দে লিখিত হয়। দৃষ্টান্ত-

"কুরবানি ইয়ে হুসেন সে চালতি হে কায়নাত

সাতকে মে ইনকে লাল কা পালতি হে কায়নাত

বারনা জামিনে কার্‌বসে উঠতি ওহ্‌ জালজালে

মানিন্দ মোম জ্বালকে পিঘালতি ইয়ে কায়নাত"

গ) নহা: মার্সিয়ার ছোট সংকলন হল নহা , মূলত কবি লেখন কোনও চরিত্র বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মার্সিয়ার কাব্যধর্মিতা নহাতে থাকেনা। নহা সাধারণত শের, মুসাল্লাস, রাবা ছন্দে লিখিত হয়ে থাকে। আট থেকে নয় বান্‌ধের মধ্যে নহা সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বান্‌ধ গুলিতে কবি কোন ছন্দ ব্যবহার করবেন তা কবি নিজে ঠিক করেন। সমগ্র আলোচনা যেহেতু নহাকে কেন্দ্র করে সংগৃহীত নহা থেকে যে যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেছে তা আলোচনা করা হল –

১) নহা মূলত বিলাপের গান। তবে নহাতে মনগড়া কাহিনির কোনো স্থান নেই। কবি কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মূল ঘটনার সামান্যতম পরিবর্তন না ঘটিয়ে কবি নিজের আবেগের মিশ্রনে কবিতাটি রচনা করেন।

২) পাঠক যদি চায় সাহিত্য স্বাদ গ্রহণের পাশাপাশি নহাকে ঐতিহাসিক দলিল হিসাবেও গ্রহন করতে পারেন। কারণ একজন কবি যখন কবিতা লেখেন তাকে মূল কাহিনি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানতে হয়। ভুল হলে তার লেখা মাতমের গান বলে গ্রাহ্য করা হবেনা।

৩) যখন পাঠক নহা বা মার্সিয়া পড়েন, তার যদি কারবালার চরিত্র ও ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা না থাকে, তবে পাঠক কবিতার চরিত্র সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। দৃষ্টান্ত-

"কারতে থে কাভি মুহাম্মাদ সে কাভি অনো সে বাতে

কাসিম সে কাভি অর কাভি জনো সে বাতে"

এই দুই পংক্তিতে কবি মুহম্মদ,অন, জন, কাসিম চরিত্রের উল্লেখ করেছেন। পাঠক যদি নাই-ই জানেন তারা কারা তবে ঘটনার প্রেক্ষাপট যেমন বুঝতে পারবেন না, তেমনই নহা যে উদ্দেশ্যে লেখা সেই প্রধান কারণটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ঊঠবেনা।

৪) কবিতায় কবি কারাবালার একাধিক চরিত্রকে ও একাধিক ঘটনার প্রসঙ্গকে উপস্থাপন করেন। কবির উপস্থাপনাই শেষ কথা, তারপর সেই ঘটনা কিংবা চরিত্র সম্বন্ধে পাঠককে জানানোর কোনও দায় কবির থাকেনা। দৃষ্টান্ত-

মওজো মে তালাতুম হে ইয়ে খওফ হে

দরয়ায়ে না ফির দুনিয়া খ্যায়বার কি কাহানি কো

খ্যায়বারের কাহিনি কি? কোন প্রসঙ্গে কবি বলছেন তা পাঠকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তবে যারা নহা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত তারা সকলেই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে কারবালার ঘটনার চর্চা করেন।

৫) নহা শিয়া সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ, কবি বারবার শিয়া আইডেন্টিটির দিকটি কবিতা মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে ইসলাম সংক্রান্ত বার্তা দিতেও কবি ভোলেন না।

সার পিঠ কে রো মোমিনো পোশাকে সিয়ামে

অর্থাৎ কবি কালো পোশাক ধারণ করে মাথা বা বুক চাপড়িয়ে বিলাপ করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন।

৬) কবি নহাতে এক রৈখিক একটি বর্ণনা দিয়ে চলেন। টুকরো টুকরো ঘটনা , স্মৃতিকথাকে (নহা ১৭, ৩ বান্ধ) কবি নহার মধ্যে গেঁথে চলেন।

৭) কারবালার শহীদদের প্রতি কবি যখন কবিতা গুলি নিবেদন করছেন, সেই নিবেদনে কবির তাদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ফুটে ওঠে। তাদের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি একাধিক বিশেষণ প্রয়োগে চরিত্র গুলিকে নানা গুণে গুনান্বিত করে তোলেন। সাক্কা-এ- আব্বাস (পিপাসার্ত কে জল দানকারী) গাজী আব্বাস (সিংহের ন্যায় আব্বাস) , ৮ নং নহাতে ইমাম হোসেন কে বলা হচ্ছে আইয়ুব কা ফাখ্‌র অর্থাৎ যা জ্ঞানে দুনিয়া গর্বিত বা মহাজ্ঞানী। ১৬ নং নহার ৭নং বান্‌ধে জয়নব কে বলা হচ্ছে – সানি তেরি বিবি অর্থাৎ তার মত নারীর নজির আর নেই। এই ভাবে বহু ক্ষেত্রে কবি প্রতি চরিত্র কে নানা মহিমাময় বিশেষণ প্রয়োগে বিশেষায়িত করেছেন।

৮) বেশীর ভাগ নহাই লিখিত হয়েছে ঘটমান বর্তমানে কারণ কবি কোনও বিশেষ চরিত্র নিয়ে নিজে বলছেন, বা কোনো চরিত্রকে মুখে বিলাপ বসাচ্ছেন তখন তা বিলাপ করতে করতে স্মৃতিকথনে দিকে যায়,

তাই চরিত্র গুলির কার্যকলাপ বর্তমান ও ঘটমান বর্তমানে ঘটিত হয়। জয়নব ইয়ে দুয়া মাঙ্গি হাথো কো উঠাকার

ইয়ে মেরে রাব আব্বাসকো তু সাব্‌র আতা কার (নহা ১৬)

৯) যে চরিত্র গুলি শহীদ হয়েছেন তাদের জবানিতে কবিতা গুলি রচিত নয়। বরং কবির বর্ণনায় বা কারবালা ঘটনার সাক্ষী যারা বেঁচে ছিলেন এই ঘটনা চলাকালীন সময়ে তাদের বর্ণনার মধ্যে শহীদদের তথা নিজেদের আপন জনেদের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের মর্যাদা ব্যক্ত করেছেন। তবে বেশির ভাগ নহা জয়নব, সাখিনা ও কবির জবানিতে লেখা হয়েছে।

১০) কারবালার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন ৭২ জন, রাসুলের পরিবারের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা ব্যতীত আর কারো নাম উল্লেখ নেই কবিতার মধ্যে। তবে বিরোধী পক্ষের কিছু চরিত্র যেমন, হুরমূলা, শিম্‌র, সাদ, কয়েকজনের নামের উল্লেখ আছে। গাজি আব্বাস, আলি আকবর, ইমাম হোসেন, কাসিম, অনো মহম্মদ, আলি আসগার ও নারীদের মধ্যে সাখিনা ও জয়নব সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল চরিত্র। আর কিছু চরিত্রের সাক্ষাত মেলে সেগুলি বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন কাসিমের মা ফারওয়া, জয়নবের বোন কুলসুম, সাখিনার বোন সগরা, আসগারের মা রুবাবের প্রসঙ্গ একাধিক বার এসেছে।

১১) নহার কাহিনির মধ্যে সময়ের যে বিস্তার তাকে মূলত চারটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে –

এক, মাদিনা করে কুফা গমন পর্ব (নহা ৩৪),

দুই, কারবালায় তাবু স্থাপন ও যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব (নহা ১৬, নহা ৫, নহা ১),

তিন, যুদ্ধ চলাকালীন পর্ব (নহা ১৩, নহা ১২, নহা ৭),

চার, নিঃস্ব ও বন্দী দশা পর্ব (নহা ৪, নহা ১৫, নহা ৯, নহা ৩২)।

১২) প্রত্যেকটি নহার শুরুতে কবি তার নামের পাশে জন্মস্থানের পরিচয় দেন যেমন দাবির লখনোই, আফাক মুর্শিদাবাদী ইত্যাদি এবং শেষ স্তাবকে কবি নিজের নামের উল্লেখ করে থাকেন। এছাড়া যিনি নহা খান বা নহা যিনি পড়ছেন তার নামের উল্লেখও ক্ষেত্র বিশেষে হয়ে থাকে।

“নহা পাড়তে হে জাব তেরে নাজির গাম- এ তাড়াপ কার

মাতম কাড়ে হার এহলে আজা আশ্‌ক বাহাকার

হে আশিক না চিজ কে আরমান আলি আসগার” (নহা ২৪)

এই কবিতাটি নহাখান নাজির পাঠ করেছেন বলে তার নামের উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার

শিয়াদর্শন ও নহা কেন্দ্রিক আলোচনা মুখ্য বিষয় হওয়ার কারণে শিয়া উত্থানের সময় থেকে প্রাক ইসলামী ইতিহাস ও রাজনীতি পর্যালোচনা এবং সে ইতিহাস থেকে যে সাহিত্যধারার জন্ম হয়েছে – সেই দিকটি এই সন্দর্ভটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেখানে নহা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, নিশ্চিত রূপে ধরে নিতে হবে সেই স্থানে শিয়াপন্থিদের অভ্যুত্থান হয়েছে। আমার কাজটি যেহেতু ক্ষেত্রসমীক্ষা মূলক কাজ, সেহেতু কাজের সূত্রে শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। তারা সকলেই হজরত আলি ও তার পুত্র হোসেনকে নিজেরদের আদর্শ বলে স্বীকার করেন। তাদের আনুগত্য এতটাই স্পষ্ট যা অন্য মতাদর্শীদের মধ্যে দেখা যায় না। বাচ্চা থেকে বড় সকলে রাসুল-আলি-হোসেন কেন্দ্রিক সকল ইতিহাস সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ধারণ করে । সালাম বা মার্সিয়া সকল শোকগাথাগুলি রচিত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনার উপর, কবির আবেগের মিশ্রণ থাকলেও কবি মূল ঘটনাকে সামান্যতম বদল করেন না। শোকগাথার চর্চা শিয়াপন্থিদের ধর্মচর্চার মৌলিক বিষয়, তাই সকল শিয়াপন্থিরা শোকগাথা স্বরূপ কবিতার মাধ্যমে বর্ণিত ইতিহাস শুনে বড় হন। আর তাদের থেকে যে সাহিত্যধারা জন্ম নিয়েছে তা, পুরোটাই ট্রাজেডি নির্ভর, সেই কারণে এই ট্র্যাজিক সাহিত্যধারার বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় আধ্যায়

নির্বাচিত সালাম ও নহা গুলির পাঠ বিচার

ভূমিকা

ক্ষেত্রসমীক্ষা করে যে যে শোকগাথা গুলি সংগ্রহ করেছি; সেগুলি পারসী, উর্দু ভাষার সংমিশ্রনে রচিত, আবার কিছু কিছু শোকগাথার মধ্যে কুরবাতি ভাষার প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। যারা উর্দু, ফারসী কিংবা কুরবাতি বোঝেন না, তাদের ক্ষেত্রে শোকগাথা গুলির প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হবেনা। সেই কারণে শব্দার্থ ও ভাবার্থ আলাদা করে আলোচিত হয়েছে। সালাম, সোজ, মার্সিয়া, কাতাহ্, কাসিদে, নাজ্ম, সায়েরী- এমন বহু সংরূপ থাকা সত্ত্বেও নহা ও সালামের গুটিকতক নমুনা পেশ করার কারণ কাসিদে, নাজ্ম, সায়েরী এগুলি কোনোটাই শোকগাথা নয়। মার্সিয়া, সোজ, কাতাহ্, সালাম, নহা এগুলি সবই শোকগাথা, যা ট্রাজেডির ফর্মে লেখা। এর থেকে বিষয় নির্দিষ্ট করার জন্যে 'নহা' বেছে নেওয়া হয়েছে তার কারণ সকল ক্ষেত্রগুলি নিয়ে একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব ছিলনা। গবেষণার কলেবর ও সময়ের কথা ভেবে ছোটো একটি বিষয় বেছে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নহা'র সঙ্গে সালামকে যুক্ত করার প্রধান কারণ সালাম পাঠ করেই নহা পাঠ করা হয়। সালামের কাজ অনেকটা স্তুতি গাওয়ার মত। সালাম ও নহা'র বিষয়গত কোনো মোটাদাগের পার্থক্য নেই। তবে উপস্থাপনায় কিছুটা তফাৎ আছে। সালামের মধ্যে কারবালাবার ঘটনার উল্লেখ থাকলেও সামাজিক বার্তা দেওয়া হয় ইসলামিক আদর্শের আলোকে, আর নহাতে কারবালাকেন্দ্রিক নানা ঘটনাকে তুলে ধরা হয় বিলাপের মধ্যে দিয়ে।

সালাম

রোকার মজলুম সাকিনা

কারতি থি বায়া রোকার মজলুম সাকিনা

হাম লুট গেয়ে পারদেস মে ইয়া শাহে মাদিনা।

পানি কে এ ওয়াজ তির লাগা হাল্কপে আকার

রুখসাত হুয়ে আসগার মেরে বাবাসে লিপাট কার

ইস গাম মে বেয়েঠ জাতি হে দুখিয়ারি কা সিনা

হাম লোগো কে খ্যায়মো মে ইয়াহা শোর বাপা হে

ন্যাজা আলি আকবর কে কালিজে মে গাড়া হে

আব হামকো বেহেন[60] নাম লেকে পুকারেগি কাভি না

ক্যায় বাত হে আব্বাস চাচ্চা ভি নেহি লওটে

তারিখ হুয়ি জাতি হে দুনিয়া মেরে আগে

আব ডুবনে ওয়ালি হে উমিদো কা সাফিনা

কাসিম ভি নেহি অনো মুহাম্মাদ ভি নেহি হে

মুশকিল মে মেরি জান হে দাম ঘুটনে লাগি হে

পালভার গাওয়ারা নেহি ইস হাল মে জিনা

গারদিশনে ওয়াতানসে হামে জিস দাশ্ত মে লায়ি

জেহ্রা কি গুলিস্তান পে আয়ি হে তাবহায়ি

আয়িনা হামে রাস মুহাররম কা মাহিনা

আশিক গামে শাব্বির মে ওহ্ বেকাসো মুযতার

জিন্দা মে দাম তোড় দিয়ে শাহ্ কে দাখতার

রোনে লাগে হার এহলে আজা পিঠ কে সিনাহ

– আশিক মুর্শিদাবাদি

[60] বেহেন অর্থাৎ বোন সাখিনা, তার বড় ভাই আলি আকবরের মৃত্যুর ঘটনায় বলেছেন। আকবর আর কখনো সাখিনাকে বোন বলে ডাকার জন্যে জেগে উঠবেনা।

ভাবার্থ

এই সালামের মধ্যে দিয়ে কবি হোসেন কন্যা সাখিনার মনের অবস্থা তুলে ধরেছেন। কারবালার ময়দানে হোসেন পরিবারের সঙ্গে রক্তখেলা শেষ করে যারা জীবিত ছিলেন তাদের অবস্থার কথা ছোট্ট সাকিনার মুখে স্বজন হারানোর আর্তি হিসেবে ফুটে উঠেছে।

শোকাতুরা হয়ে সাখিনা তাদের ওপর হওয়া নির্মম কাহিনীর বৃত্তান্তটি সকলকে শোনাচ্ছেন, সে বলছে তার মাতৃভূমি মাদিনাকে উদ্দেশ্য করে যে তারা সকলে পরদেশে এসে ধ্বংস হয়ে গেল। পানির জন্যে তার ছোট ভাইকে হোসেন জল পান করাতে নিয়ে গেলে এজিদবাহিনী শিশু আসগারের গলায় তীর নিক্ষেপ করে। বাবার বুকের মধ্যে থেকেই সে ইহজীবন ত্যাগ করে, এই দুঃখে ভারে বুক ভারী হয়ে আসছে। গোটা তাবুর মধ্যে কান্নার রোল ছড়িয়ে পড়েছে। বড় ভাই আলি আকবরের বুকে বল্লম গেঁথে আছে, সে আর কখনোই তাকে বোন বলে ডেকে উঠবেনা। তার চাচা আব্বাস সাখানির জন্যে জল আনতে গেছে সেও ফিরে আসেনি। কাসিম, অনো মহম্মদ তারাও ফিরে আসেনি, বিবি ফাতিমা তৈরি করা ফুলের বাগান ছারখার হয়ে গেছে। মহরম মাসের এই ঘটনা সাখিনার সহ্যের বাইরে। কবি আশিক বিলাপ করছেন সেই নিস্পাপদের কথা ভেবে যারা প্রাণ দিয়েছেন। সাখিনাও বন্দীদশাতে প্রাণত্যাগ করেন, এই দুঃখে সকল বিলাপকারী একসঙ্গে বুক চাপড়িয়ে শোক করছেন।

শব্দার্থ

বায়া- প্রকাশ করা বা ব্যক্ত করা। মজলুম- অসহায়। সাকিনা- ইমাম হোসেনের কন্যা। লুট গেয়ে- বরবাদ হয়ে যাওয়া। পারদেস- বিদেশ। শাহে- সম্মানার্থে শাহে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। হাল্‌ক- গলা। রুখসাত- প্রস্থান, এখানে ইহলোক থেকে পরলোকে গমনের কথা বলা হয়েছে। আসগার- ইমাম হোসেনের ১৮ মাসের পুত্র। লিপাটকার- আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে। গাম- দুঃখ। সিনা- বুক; এখানে হৃদয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। খ্যায়মো- তাবু। শোর- শোরগোল,কান্নার রোল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাপা- ছড়িয়ে পড়া। ন্যাজা- অস্ত্র বিশেষ। কলিজে- অন্তর। গাড়া হে- গেঁথে আছে। আব্বাস- খলিফা আলির দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র, (আব্বাসের মাতার (উম্মুল বানিন) নাম সঠিক ভাবে জানা যায়না), ইমাম হোসেনের ভাই। পুকারেগি- আহ্বান করা। লওটে- ফিরে আসা। তারিখ-

এই সময়ে। সাফিনা- আশার আলো। গারদিশ- গন্তব্য। ওয়াতান- মাতৃভূমি। দাশ্‌ত- মরুভূমি। জেহ্‌রা- বিবি ফাতিমার আরেকটি নাম, জেহ্‌রা শব্দের অর্থ গৌরবমন্ডিত যে নারী। গুলিস্তান- ফুলের তোড়া। তাভায়ি-ধ্বংস নেমে আসা। ঘুটনে লাগি- দম বন্ধ হয়ে আসা। গাওয়ারা- সহ্য করা। বেকাসো- অসহায়। মুযতার- শোকে আকুল। শাহ- ইরানী সম্রাটকে শাহ বলা হয়। দুখতার- কন্যা। অ্যাহলেআযা- সকল বিলাপকারী।

জিদ না কারো মানলো হাল্লে মুশকিল কো পেহচান লো

হাক্বকে জয়নব সে জিনকো মিলা মারতাবা

এক ইবাদাত হে নুর কা তাশকিরা

আজমাতে মুর্তোজা জানলো হাল্লে মুশকিল কো পেহচান লো

এক হি নারসে হে নবি অওর আলি

হে আবতাক মুসলমান সামঝা নেহি

ইনকে সঙ্গে মে জান্নাত মুসালমান লো হাল্লে মুসকিল কো পেহচান লো

কুল্লে ইমান জিনকো নবি নে কাহা

জিনকো মানা নুসিয়ারিও নে আপনা খুদা

ছোড়কার কুফ্‌র কো ইমান লো হাল্লে মুসকিল কো পেহচান লো

জাহিলো কে বাতায়ে হুয়ে রাস্তে

না সামাঝ হে জাহান্নাম তেরে ওয়াস্তে

পানি পিনা হে পিলো মাগার ছানলো হাল্লে মুশকিল কো পেহচান লো

বগজে হায়দার কো লেকার জো মার জায়েঙ্গে

কব্‌র মে ভি সুকু(ন) ওহ্‌ নেহি পায়েঙ্গে

মওত সে পেহলে বাখসিশ কা সামান লো হাল্লে মুসকিল কো পেহচান লো

হোগা জিসদাম জাহুরে ইমামে জামা

বাচ সাকেগা না উস দাম কই-ই বেইমা

ইয়া আলি কেহকে হাথো মে কুরআ(ন) লো হাল্লে মুসকিল কো পেহচান লো

ইয়ে না কেহনা কে আশিক বুলায়া নেহি

মাদ-নে মওলা কা হামসে তো দিওান লো হাল্লে মুসকিল কো পেহচান লো

– আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এই সালামের মধ্যে দিয়ে কবি আলির স্তুতি গেয়ে সকল মুসলিমদের কাছে একটি পয়গাম দিতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন বিবি জয়নব হলেন সত্যের অধিষ্ঠাত্রী, কারণ তিনি জন্ম নিয়েছেন আলীর ঔরস থেকে। আলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললেই জীবনের সমস্ত সমস্যার হাল বেরোনো সম্ভব। একই নুর বা জ্যোতির থেকে সৃষ্টি হয়েছেন রাসুল এবং তার জামাতা আলি। এনাদের বলে দেওয়া পথ অনুসরণ করলেই জান্নাত লাভ সম্ভব বলে কবি মনে করেছেন। পূর্ণ ইমানের স্বীকৃতি স্বয়ং রাসুল আলিকে দিয়েছেন। বিধর্মীরা যাকে নিজের আকা স্বীকার করে নিয়ে নাস্তিকতা ত্যাগ করে আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছেন- তিনি হলেন আলি। যারা আলির প্রতি বিদ্বেষ রাখেন তারা কবরে গিয়ে শান্তি পাবেন না। কুরানের কথা আর আলির বাণির মধ্যে কোনও তফাৎ নেই, তাই কবি সকল মুসলিমকে আহ্বান জানিয়েছেন আলির অনুসারী হওয়ার জন্যে। আলির প্রশংসায় মত্ত কবি সমস্ত বলতে চান রাসুলের পর আলির সম্মান সব কিছুর উর্দ্ধে বিরাজমান।

শব্দার্থ

হাল্লে- যার থেকে সমাধানের পথ পাওয়া যায়। পেহচান- চিনে নেওয়া। হাক্ব- অধিকার। মারতাবা- মূল্য। নুর- পবিত্র আলো, যা অন্তরের কালিমাকে মুক্ত করে। তাসকিরা- আদেশ, উপদেশ। আজমাতে- ব্যবহারিক জীবনে

নিয়ে আসা। মুর্তোজা- ইমাম হোসেনের আরেকটি নাম। কুল্লে- সম্পূর্ন, পুরো। ইমান- বিশ্বাস। নুসিয়ারিও- সম্প্রদায়। কুফ্‌র-নাস্তিকতা। জাহিলো- আত্যাচারী। ছানলো-পরীক্ষা করে নেওয়া। বগ্বজে- হিংসা, দ্বেষ। হায়দার- হজরত আলী। বাখশিশ- উপহার। জিসদাম- যখন। জাহুরে- উত্থান, আবির্ভাব। ইমামে জামা- প্রধান ইমাম। মাদ-নে-প্রশংসা। মওলা- সবার চেয়ে বড় যিনি। দিওয়ান- ভালোবাসা

যাব লিয়ে মাসকিজা

যাবলিয়ে মাশকিয়া যাসাফদার জায়েগা

দেখকার ফোওজে লায়ি থাররায়েগা

আল্লাহ জো শাহে ইবন্-এ-মর্তোজা

কাপতি থি দেখ কার জিনকো কাজা

লাব পে থি নারায়ে হাক্ব সাদ মারহাওয়া

গুন্‌জ উথি কারবালা মে ইয়ে সাদা

উনসে লাড়নে জো গেয়ে মার জায়েগা

নেহ্‌রে পার পৌহচে জো ফারজান্দে আলি

মাশ্‌ক-কে কো পানি সে ভারলি জিস ঘাড়ি

জালিমো নে উনকো ফওরান ঘেরলি

ছিদ গেয়ি মাশকিজা অউর বাজু কাটা

আব সাকিনা তু না পানি পায়েগা

লাশে আব্বাসে জারি কই খাক পার

হার দো বাজু থি জুদা তান খু(ন) সে তার

আশিক-এ-শাব্বির না আয়ে লওট কার

আব নবিযাদো কা ঘার লুট জায়েগা

– আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এই সালামের মধ্যে কবি গাজি আব্বাসের মৃত্যুর ঘ্যটনাটি তুলে ধরেছেন। হোসেন কন্যা সাখিনা আব্বাসের খুব স্নেহের পাত্রী ছিলেন, শিশু কন্যার সমস্ত আবদার তিনি পূরণ করতেন। কারাবালার তপ্ত ভূমিতে পিপাসার্ত সাখিনা তার চাচার কাছে জলের প্রার্থণা করে, আব্বাস সাখিনার অনুরোধে জল আন্যে গিয়ে কিভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন তার ছবিটি কবি এই সালামের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন।

আলি পুত্র আব্বাস যখন জলের পাত্র নিয়ে নদীর দিকে এগোচ্ছেন তখন তাকে দেখে এজিদ সৈন্যরা ভয়ে কম্পমান। আব্বাসের স্তুতি বর্ণনায় কবি বলেছেন যার মুখে সবসময় সত্যের ধ্বনি ধ্বনিত হয়, তার ধ্বনি এখনো কারবালায় ধ্বনিত হয়। যার শৌর্যের সামনে ক্বাজা অর্থাৎ মৃত্যু[৬১] অবধি মাথা নত করে। সেই আব্বাস যখন ফোরাত (ইউফ্রেট্স) নদীতে জল আনতে গেলেন এনং তাঁর জলের পাত্র পূর্ণ করলেন তখনই এজিদের সৈন্য তাকে চারিদিক থেকে ফিরে নেন। সেই মুহুর্তেই তার শরীর থেকে দুই হাত ছিন্ন করে দেন সৈন্যরা, আর তার হাত থেকে জলের কুঁজটি পড়ে যায়। আব্বাসের মৃত দেহটি মরুর বালির মধ্যে পড়ে আছে , রক্তে রক্তাক্ত তার দেহ, হাত দুটি ছিন্ন হয়ে শরীর থেকে আলাদা হয়ে আছে।

কবি আশিক চিন্তিত হয়ে বলছেন তিনি যদি তাবুতে ফিরে না যান তবে সাখিনা জল পাবেনা, রাসুলের পরিবারকে কেউ বাঁচাতে পারবেনা।

শব্দার্থ-

মাশকিজা- জলের পাত্র। ফওজে- সৈন্যের দল। জাসাফদার- ইবনে আব্বাসের নামের একটি বিশেষণ, বিশ্বাসী অর্থে ব্যবহৃত। থারথারায়েগা- কাঁপতে থাকা। কাজা- মৃত্যু।নারায়ে-ধ্বনি। মারহাওয়া- শুভ কোনও কাজ হলে

[61] মৃত্যু বলতে এখানে মালাকুত-এ- মওত বা ফারিস্তা আজরাইলকে বোঝানো হয়েছে। আজরাইল এবং যমরাজের ধারনাটি অনেকটা একই। তার কাজ প্রানী দেহ থেকে প্রাণবায়ু বের করা। জীবন মৃত্যুর ডরি এই ফারিস্তার হাতেই থাকে। বলা হয় আজরাইলরে রূপ এতটাই ভয়ালো যে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে কারোও পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, মৃত্যুর সময়েই সকল জীবের ও প্রানীর তার সঙ্গে সাক্ষাত হয়- মোস্তফা, মহম্মদ(সম্পাদিত) (২০০১)। *বেহেশ্‌তি জেওর*। ঢাকা: আরাফাহ্ পাবলিকেশন।

মারহাওয়া বলে উৎসাহ দেওয়া হয়, উৎসাহ প্রদানকারী শব্দ। গুঞ্জ- প্রতিধ্বনিত হওয়া। নেহ্‌রে- নদী। ফারজান্দে- পুত্র। জালিম- অত্যাচারী। এখানে এজিদ বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে। ফোরান-সঙ্গে সঙ্গে। ঘের লি- ঘিরে নিয়েছে। ছিদ- ছিন্ন হয়েছে এমন। জারি- মন্দ কিছু ঘটে চলেছে এমন। খাক -ছাই। নবিজাদো- নবির পরিবারবর্গ। শাব্বির- ইমাম হোসেনের আর একটি নাম।

তেরে বাদ কা মাঞ্জার আব্বাস

ক্যায় বাতাউ মে তেরে বাদ কা মাঞ্জার আব্বাস
কেয়সা উজড়া হে গুলিস্তানে পায়েম্বার আব্বাস

মেইনে দেখা কে চালে আতে হে মাখতাল সে
আপনে কান্ধেপে লিয়ে লাশায়ে আকবর আব্বাস

খালি ঝুলে কো ঝুলাতে হুয়ে কেহতি হে রোবাব[৬২]
হাল্‌ক তেরে হো গেয়ে অউর সো গেয়ে আসগার আব্বাস

জিস মে তিরো পে হে সার নোওকে সেনা পার শাহ কা
খুন রোতা হি রেহেগা তেরে খওহার আব্বাস

পুশ্‌ত পার বার গিরা হায়ে ইয়ে বিমার ইমাম
কিসসে ফারিইয়াদ কার বারিসে মিম্বার আব্বাস

সান্‌স লেনা ভি হে দুশওয়ার সাকিনা কে লিয়ে
চান্দ লামহ কে হে মেহমান ওহ্‌ মুজতার আব্বাস

[62] আলী আসগারের জন্মদাত্রী হলেন রোবাব

জিসকো বেপারদা না দেখা হে দেখ কাভি চাশমে ফালাক

উসকো বেপারদা ফিরায়া গেয়া দারদার আব্বাস

জান-এ-বে কারবো বালা দেখ কে জয়নব আশিক

বলি আব লুট চুকা জেহ্‌রা কা ভারা ঘার আব্বাস

– **আশিক মুর্শিদাবাদি**

ভাবার্থ

আব্বাসের মৃত্যুর পরে হোসেনের পরিবারের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তার বর্ণনা দিয়েছে কবি এই কবিতাটিতে। কবি যেন অনুযোগের স্বরে আব্বাসের কাছে কারবালার ঘটনার সমস্ত অন্যায়ের বিবরণ দিচ্ছেন।

কবি গাজি আব্বাসকে জানাচ্ছেন আকবরের মৃত দেহকে কিভাবে হোসেন কাঁধে করে নিয়ে আসছেন, খালি ঝুলা (দোলনা) দেখে আসগারের মাতা রুবাব কেঁদে পাগল হয়ে আছেন। এমনকি হোসেনের সারা শরীরে তীর নিক্ষেপ করার পরেও তার শরীর থেকে মাথা আলাদা করে, সেই মাথা বল্লমে গেঁথে এজিদের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এসমস্ত ঘটনার সাক্ষী হোসেন দুহিতা জয়নবের চোখ থেকে অশ্রুর বদলে রক্ত ঝরছে। হোসেনের অসুস্থ পুত্র কেও তারা ছাড়েনি। সবার শাহাদাত হয়েছে, এখন তাদের বাঁচানর মওত কেউ জীবিত নেই। শ্বাস নেওয়া সাখিনার জন্যে বড় কঠিন হয়ে উঠেছে। সাখিনাও হয়ত পৃথিবীতে কিছুক্ষনের অতিথি। যাদের নেকাব বা পর্দাছাড়া কখনো দেখা যায়নি তাদের বেপর্দা করে কুফার পথে পথে ঘোরানো হয়েছে। কবি আশিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলছেন, বিবি ফাতিমার ঘর সমস্তটাই উজাড় হয়ে গেছে।

শব্দার্থ

মাঞ্জার- অবস্থা। উজড়া- ভেঙে যাওয়া, উজাড় হয়ে যাওয়া। গুলিস্তানে পায়াম্বার- স্বর্গের ফুল। মাখতাল- যুদ্ধক্ষেত্র। কান্ধেপে-কাঁধে। লাশায়ে- মৃতদেহ। ঝুলে- দোলনা। রুবাব- হোসেন পত্নী, আলি আসগারের মাতা। নওকে- লম্বা হাতলযুক্ত তির। খওহার-বোন। পুশ্‌ত- বংশ। ফারিয়াদ- অভিযোগ করা। বারিস- সন্তান-সন্ততি।

ফালাক- আকাশ। চাশমে- প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মিম্বার- অনেকটা সিড়ির মত দেখতে হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হয়। প্রাচীন আরবে বক্তা মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতেন। দুশওয়ার- কঠিন। চান্‌দ লামহো- ক্ষণিকের। মেহমান-অতিথি। বেপরদা- আব্রুহীন। দারদার- পথেপথে।

আলি কে সের

এক আখরি কাম কারো অ্যায় আলি কে শের,

পানি কা ইন্তেযাম কারো অ্যায় আলি কে শের।

পানি কি বুন্দ বুন্দ কো বাচ্চে তারসে হ্যায়

এক পেশ উনকো জাম কারো অ্যায় আলি কে শের।

কিস তারহা দেখো দার পে সাকিনা হে মুন্তাজির,

আঁখে সুয়ে খায়াম কারো অ্যায় আলি কে শের।

জানু পে সার কো রাখকে ইয়ে বোলে ফালাক ওয়াকির

ভা'য়ে সে কুছ কালাম কারো অ্যায় আলি কে শের।

বারচি নিকালে সিনে সে আকবর সে ইস তারহা,

ইমদাদ-এ-তিষ্ণা কাম কারো অ্যায় আলি কে শের।

আসগার কে সাথ খাতম হুয়া লাশকার-এ-ইমাম,

আন নুসরাতে-এ-ইমাম কারও অ্যায় আলি কে শের।

চারো তারাফ সে ঘেরে হুয়ে হ্যায় হুসেন কো,

দুশমান কাতলে-আম-কারো আয়ে আলি কে শের,

হ্যায় ইলতেযা কে আতহার-এ-দিলসোজ কা কবুল,

আন্সু ভারা সালাম কারো অ্যায় আলি কে শের।

- আতহার মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এই নহাতে কবি গাজি আব্বাসের কাছে অনুরোধ করছেন, যে তিনি যেন একটূ জলের ব্যবস্থা করেন। মুরুভূমির তপ্ত আবহাওয়ায় বাচ্চারা পিপাসায় ছটফট করছে। জলের জন্যে আধীর অপেক্ষায় সাখিনা পথ চেয়ে আছে। শিশু আসগার ও আকবেরর মৃত্যু হয়েছে। আকবেরর বুকে তির বিধে মৃত্যু হয়েছে। আকবরও জলের ব্যবস্থা করার জন্যে এজিদবাহিনীর মুখোমুখি হলেও তিনি মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসতে পারেননি। আসগারের মৃত্যুতে হোসেন জীবিতলাশে পরিণত হয়েছেন। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য চেয়েছেন কবি আব্বাসের কাছে। চারদিক থেকে হোসেন সৈন্যদ্বারা ঘিরে আছেন, শত্রুদের জবাব দিতে আব্বাসের সাহায্যের প্রয়োজন। তাদের দুঃখে কাতর কবির প্রার্থণা যেন গাজি আব্বাস গ্রহন করেন এবং কবি তাঁকে অশ্রুভরা চোখে সালাম জানিয়েছেন।

শব্দার্থ

আখরি কাম- অন্তিম কাজ। শের- সিংহ। ইন্তেযাম- ব্যবস্থা করা। বুন্দবুন্দ- এক ফোঁটা। তারসে-ছটফট করা। জাম- পেশ করা। দারপে-দরজায়। মুন্তাজির- অপেক্ষারত। সির- মাথা। ওয়াকির- সিদ্ধান্তকারী। কালাম- আলাপ-আলোচনা। বারচি-তির। ইমদাদ-এ-তিষ্ণা- তৃষনার্তদের তৃষ্ণা নিবারণকারী। লাশকার- সৈন্য। নুসরাত- জয় লাভ, সাহায্য করা। ইলতেযা-প্রার্থণা। দিলসোজ- অতিশয় ব্যাকুল।

শাব্বির মে হে দিওয়ানে

মুর্শিদাবাদ তেরি শান হে মাতাম খানে,

মাতামি মাতাম-এ শাব্বির মে হে দিওয়ানে।

ইয়া হুসেনা কি সাদা আতি হে হার জানিব সে

কারবালা সাব কি জুবান পার হে তেরে আফসানে।

ছোড় কে শাহ কো যাতা নেহি কই সাথি,

অ্যায়ইসি শাম্মা হে কাহি অর না য়ে পারওয়ানে।

ইয়া নবি আপকি উম্মাত হে য়ে ক্যায়সি উম্মাত

সাক্‌লে-এ- আকবর মে ভি যো আপকো না পেহচানে।

প্যায়সে বাচ্চো কি তাড়াপ অর উমিদে লেকার,

চালে আব্বাস--এ আলি নেহ্‌র পার পানি লানে।

নুর আঁখো পে নেহি অর কামার মে তাকাত

গাম উঠায়ে হে বহত সাক্‌ত মেরে মওলা নে,

কাহি আব্বাস হে কাসিম কাহি আকবর আজগার

কারবালা কিত্যনে হে আবাদ তেরে বিরানে।

থি ইয়েহি শাম-এ গারিবান মে সাদা জয়নব কি

কই আজায়ে সাকিনা যারা বেহলেনে

কারবালা দেতি পেয়গাম- এ-উখুয়াত হামকো
ইয়ে আজাদার আত'হার হ কাভি বেগানে।

-আতহার মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

মুর্শিদাবাদের গৌরব মাতমখানা[৬৩]। মাতমখানায় সকল মাতম ও মাতমীরা হোসেন প্রেমে মত্ত হয়ে আছেন। এই মাতমখানায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হোসেনপ্রেমীদের সমাগম ঘটে। তাদের সবার মুখে কারবালার কাহিনি চর্চিত হয়। হোসেন ও হোসেনপ্রেমীদের ভালাবাসাকে বোঝাতে কবি এখানে রূপকের ব্যবহার করেছেন। হোসেন যদি এক নুর বা জ্যোতির সমান হন তবে, তার প্রেমীরা প্রজাপতি। অর্থাৎ হোসেনপ্রেম এই মাতমীদের মধ্যে এত দৃঢভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে যে তারা সবস্ব ত্যাগের জন্যেও সর্বদা প্রস্তুত। যারা আকবরকে হত্যা করেছে তাদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন, তারা কেমন নামধারী মুসলমান যারা হোসেন প্রতিচ্ছায়া আকবরকে হত্যা করার মত জখন্য পাপ করতে পারে। বাচ্চাদের পিপাসা মেটানোর জন্যে আব্বাস চলেছেন নদীর দিকে , শত্রুদের প্রহারে তাঁর চোখের দৃষ্টি আবছা হয়ে আসছে এবং দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি আর নেই। কাসিম, আকবর, আসগার, আব্বাস সকলের মৃত্যুর সাক্ষী এই কারবালা। মহরমের আশুরার দিনে একের পর এক শোক পেয়ে জয়নব তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছেন। তাকে শান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই। কবি আত'হার বলছেন সকলে একে অপরের অপরিচিত হলেও কারবালার কাহিনির মধ্যে দিয়ে হোসেন সকলের মাঝে ভাতৃত্বতা গড়ে তোলার পয়গাম দিয়েছিলেন।

শব্দার্থ

মাতামখানে- যেখানে মাতম করা হয়। আফসানে- গল্প, কাহিনি। শাম্মা- আলো, আগুন। পারওয়ানে- মথ, প্রজাপতি। সাক্‌ল- মুখমন্ডল। বিরান- শূণ্য হয়ে যাওয়া। শাম-এ-ঘারিবান- ১০ মহরম বা আশুরার দিন। পেয়গাম- খবর। উখুয়াত- ভ্রাতৃত্ববোধ। বেগানা- অপরিচিত ভাবা। আজাদার- রাসুল এবং হজরত হোসেন প্রতি যিনি নিজেকে সমর্পণ করে বিলাপ করেন।

লাব এ হুসেন

লাব-এ হুসেন পে হে ইস্তেঘাসা আয়ে কই,

[63] মাতমখানা যেখানে মাতম করা হয়।

মাদাত কে ওয়াস্তে মাগার না আয়ে কই

ঘিরা হে নারগা-এ -আদা মে মুর্তুজা কা খালাফ

লাব-এ-ফুরাত সে আব্বাস কো বুলায়ে কই

পুকারি পিত কে সার খামে কে দার সে জ্যনব

গালে পে ভাই কে শামশির হে বাচায়ে কই

হুসেন সাব্র কি আখির হাদো কো কেহতে হে

জাইফ কান্ধে পে লাশ-এ-জাওয়ান উঠায়ে কই

কিসি কো শাহ্দ সে শিরেন হে মওত কা আনা

গালে-পে তির-এ-সিতাম লেকে মুসকুরায়ে কই

বাজুজ হুসেন জাহান মে নজির আয়সি নেহি

রাহে খুদা মে জো ঘারবার লুটায়ে কই

হুসেন হু মে মুঝে কেহতে হে আইয়ুব কা ফাখ্র

কার এক গাম্ মেরা সাব্র আজমায়ে কই

সাহারা দেগা উসে ইশক্-এ-শাহ-দিন আত'হার

পুল-এ-সিরাত[৬৪] পে আকার জো ডগমাগায়ে কই।

[৬৪]পুলসিরাত হল একটি বিশেষ পথ, যা মৃত্যুর পরে যা সকল মানুষকে মৃত্যুর পর পাড়ি দিতেই হবে। স্বর্গ বা নরক লাভ এই পথ পাড়ি দেওয়া নির্ধারন করবে। তবে এই পথের পথিকদের যাত্রা কেমন হবে পার্থিব জীবনের কর্মের উপর নির্ভর করবে।

-আতহার মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এখানে কবি হোসনের মৃত্যুর কাহিনি এবং তাকে গৌরবান্বিত করেছেন এই নহার মধ্যে দিয়ে। কবি বলছেন মৃত্যুকালীন সময়ে তিনি বলতে চাইছেন কিন্তু তাকে সাহায্য করার জন্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। এজিদের সৈন্য তাকে ঘিরে ধরেছে, নদীর তীরে আব্বাস জল আনতে গিয়েছেন, তাকে সেখান থেকে কেউ ডেকে নিয়ে আসুক এই নরসংহার থেকে তিনি মুক্তি দিতে পারেন বলে কবির বিশ্বাস। জয়নব তাবু থেকে দেখতে পাচ্ছেন তার ভাইয়ের সারাদেহে তিরের বর্ষণ হয়েছে, এই অবস্থায় তিনি সিজদায় মাথা নত করেছেন। এদিকে পিছনে এজিদ সৈন্য সিমর্ তরোয়াল হোসেনের গর্দানের দিকে তাক করছেন। ভাইয়ের আসন্ন মৃত্যু বুঝতে পেরে বিবি জয়নব অসহায় হয়ে সাহায্যের জন্যে আহ্বান করছেন, কিন্তু তাদের সাহায্য করার মত কেউ আর জীবিত নেই, হোসেনের অপার ধৈর্য সীমার পরিচয় দিয়েছেন কবি, কিছু ঘটনা তুলে ধরে। যুবক পুত্রে মৃত দেহ তিনি নিজের বৃদ্ধ কাধে তুলে নিয়ে তাবুতে ফিরেছেন। তার বুকে আগলে রাখা ছয় মাসের পুত্র সন্তানের গলার তির নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলেও তিনি ভেঙে পড়েননি। হোসেন ছাড়া এমন নজির আর দুনিয়াতে আর নেই, যিনি আল্লহ পথে নিজের পরিবারকেও সমর্পিত করেছেন। হোসেনের জ্ঞানের মহিমা সকলেই জানেন, তার থেকে ধৈর্য ধারণ করার শিক্ষা আমাদের সকলের নেওয়া উচিত। কবি বলছেন মৃত্যুর পর যদি কারো পুলসিরাতের পথ[65] পেরোতে অসুবিধা হয় তবে হোসেন প্রেম সেই কঠিন পরীক্ষায় সফল হতে সাহায্য করবে।

শব্দার্থ

ইস্তেঘাসা -কিছু বলতে চাওয়া। নারগা-এ-আদা- বিরোধীরা। লাব-এ-ফুরাত- নদীর কিনারায়। দার- দরজা। জাইফ- বুড়ো ব্যক্তি, দুর্বল। শামশির- তরোয়াল। শিরিন- মিঠা, সুধা লাভ, মিষ্টি। নজির- উদাহরণ। রাহে খুদা কি- খুদাকে পাওয়ার পথ। সব্র- ধৈর্য। আইয়ুব- জ্ঞানের অধিকারী। ফাখ্র- গর্ব করা। পুলসিরাত- একটি পথের নাম। মৃত্যুর পর স্বর্গ ও নরকবাসী নির্ধারিত হয় পুলসিরাতের পথ পার করার সফলতার উপর। ডগ্মাগায়ে- নড়বড় করা।

না যাও আলি আকবর

না যাও আলি আকবর সগরা নে কাহা রো কার
দিল লাগতা নেহি ঘার পার আ যাও আলি আকবর

আরমা হে ইয়েহি দিলমে সেহেরে মে তুমহে দেখু
জালদি সে পালাট কে ঘর, আআ যাও আলি আকবর

তুম কেহকে গেয়ে মুঝসে আউংগা তুমহে মিলনে
ক্যা ভুল গায়ে জাকার আ যাও আলি আকবর

মা বেহেন ফুপি ভাই-ই আসগার কি জুদাই-ই মে
মায়উস হে ইয়ে খওহার আ যাও আলি আকবর

ক্যা পাকে কাজা মিলনে আওগে মুঝে ভাইয়া
চাহে মেরে লাবো পার ,আ যাও আলি আকবর

ইয়াদো কে সাহারে মে কুছ দের কি ম্যাহমা হু
পারদেস সে বারাদার আ যাও আলি আকবর।

হ্যায় কৌন মেরে সিধ কা ম্যায় জিসসে কারু বাতে
আব ক্যা কারু মে জি কার ,আ যাও আলি আকবর

কাবতাক মে বাহাউঙ্গি ইয়াদো মে ইউহি আন্সু

তানহাই-ই মে বারাদার আ যাও আলি আকবর

আহারি তুমহারি আব যায়ে তু কাহা যায়ে

আরাম নেহি পালভর আ যাও আলি আকবর

রাস্তা মে তুমহারা ইউ দেখুঙ্গি ভালা কাবতাক

আ যাও আলি আকবর

আশকো কি জাগাহ খু(ন) আব আখো সে টাপাক তা হে

পালকে হে লাহু মে তাল আ যাও আলি আকবর

কেহতি থি জাফরোকার আ যাও মেরে ভাইয়া

হোনা জায়ে মুনাভভার, আ যাও আলি আকবর

-সায়েদ রাজা মুর্শিদাবাদী

ভাবার্থ

আলি আকবরের বোন সগরার[৬৬] জবানিতে তার ভাইয়ের জন্যে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। এখানে সগরার ভাইকে নিয়ে তার আশা আকাঙ্ক্ষা গুলি ব্যক্ত করেছেন। সে বলছেন তার ইচ্ছা ছিল তার ভাইকে সেহারার[৬৭] সাজে দেখতে চান। আকবর তাবু থেকে বেরোনোর পূর্বে সগরাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন যে শীঘ্রই ফিরে আসবেন, ফিরে আসছেন না বলে তার বোন পথ চেয়ে অসেন। পরদেশে এসে তারা সকলে খুবই অসহায় বোধ করছেন, তাই আলি আকবরকে ফিরে আশার জন্যে আহ্বান করছেন সগরা। একা একা আর কতক্ষন তার পথ

[66] ইমাম হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী লায়লার কন্যা হলে সগরা ও পুত্র আলি আকবর।

[67] সেহেরা ফুলের তোইরি নেকাবের মত দেখতে হয়। বিবাহের সময় পাত্র ফুলের নেকাব পরিয়ে সজ্জিত করা হয়।

দেখবেন, আর কতই বা অশ্রু ঝরাতে হবে। কেঁদে কেঁদে তার চোখ রক্তাক্ত হয়ে গেছে। এই ভাবে নানা তাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বোন সগরা তার ভাই আলি আকবরকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে আসত বলছেন। হয়ত সগরা নিজেও জানেন যে আকবর আর ফিরবেন না তাও তিনি ভাইয়ের ফিরে আসার আশায় পথ চেয়ে বসে আছেন।

শব্দার্থ

সেহেরা- বিয়ের সময়ে পাত্রের মুখ ফুলের চাদর দিয়ে ঢাকা থাকে, সেটিই সেহেরা। আরমা- মনের ইচ্ছা। সগরা- আলি আকবরের বোন তথা ইমাম হোসেনের কন্যা। পালাটকে- ফিরে আসা। মায়উস-মন মরা হয়ে থাকা। পাকে- পবিত্র। ক্বাজা- মৃত্যু। লাব- মুখে। ইয়াদ- স্মৃতি। ম্যাহমা- অতিথি। বারাদার- ভাই। সিধকা- নিজেদের মত। পালভর-এক মুহূর্তের জন্যে। আশকো- চোখের জল। টাপাকতা- ঝরে পড়া। লাহু- রক্ত। জাফরোকার- জুলুমকারী। মুনাভভর- শ্রেষ্ঠ। খওহার- বোন।

সো যা সাকিনা

মিলেগা না আব তুঝকো বাবা কা সিনা

সো যা মেরি জাঁ সো যা সাকিনা

বহত হোগা দুশবার আব তেরা জিনা

সিতামগার কাহেগা ইয়ে পানি বাহাকার

লে পিলে সাকিনা জামি সে উঠাকার

না হোতা মুয়াস'সার তুঝে পানি পিনা

গিরোগি মেরি জান নাকে সে কিস্‌দাম

না হঙ্গে উঠানে কো আম্মু ভি উস দাম

সিসাক্তি রাহোগি মেরি জাঁ সাকিনা

সিতামগার সিতাম তুজপে জ্যাদা কারেঙ্গে

জো রোয়েগি উস পার তামাচে লাগাঙ্গে

লাগেগা তেরে ইল পে জাখ্‌ম গেহরা

নেহি কই-ই আকার জো বাচায়ে যো তুজকো

রিহা ক্যাদ সে ভি যো কারায়ে ভি তুজকো

নেহি কই-ই বাকি পারদেস মে আপনা

বিন হায়েঙ্গে আবিদ কো জাঞ্জির জালিম

বাদাল দেঙ্গে আবিদ তাসভির-এ জালিম

তাড়াপ যায়েয়া তেরা ভি মারভিয়া

সিতাম পার সিতাম তুজপে ঢায়ে গেয়ে হে

তামাছে ভি তুঝকো লাগায়ে গেয়ে হে

হে মাজবুর বাচ্চি বহত তেরা বাবা

জো লিখ্‌খা হে নহা রাজা তেরা রো কার

পাঢ়েগা কামালে ইসকো রোজ-আয়ে শাহ'বার

বুলায়েঙ্গে ইরাদে দিলশাহে ওয়ালা

-সায়েদ রাজা মুর্শিদাবাদী

ভাবার্থ

বন্দীদশায় সাখিনার অবস্থার কথা কবি এই নহাতে বর্ণনা করেছেন। কবি সাখিনাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে সে আর কখনোই তার বাবা হোসেনের ভালোবাসায় ভরা স্নেহের উষ্ণতা পাবেনা। দিন দিন তাঁর বেঁচে থাকা

আর কঠিন হয়ে উঠবে। জুলুমকারীর দল মাটিতে জল ফেলে সেখান থেকে পিপাসার্ত সাখিনাকে পিপাসা নিবারন করতে বলবে ,কিন্তু এ হেন আচরণ বরদাস্ত করবেনা। কাঁদতে কাঁদতে সাখিনা অচৈতন্য হয়ে পড়লে তার চাচা তাকে ভালোবেসে যত্ন নেবেনা। একা একাই কারাগারে অত্যাচারিত সাকিনা ফোঁপাতে থাকবে। জুলুমকারীরা তাদের ইচ্ছা মত তাকে চপেটাঘাত করতে থাকবে , বার বার সাখিনা আত্মসম্মান ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে যাবে। বিদেশের কারগারে থেকে তাকে বাঁচানোর মত কেউ আর বেঁচে নেই। সকলের শহীদ হয়েছেন এজিদের বিপুল সৈন্যের সামনে। দাদা আসুস্থ আবীদকে জঞ্জীরে বাঁধা দেখে অন্তররাত্মা কেঁপে উঠবে।অন্যায়ের পর অন্যায় হয়ে চলবে, কিন্তু অসহায় সাখিনা কিছু করার থাকবেনা। কবি রাজা সাখিনা এই অবস্থার কথা ভেবে বিষাদে ডুবে আছেন, তার মুক্তিলাভের জন্যে কবি আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করেছেন।

শব্দার্থ

সিতামগার- জুলুমকারী। মুয়াস্‌সার- মঞ্জুর করা, প্রদান করা। সিসাক্তি- চাপা কান্না, ফোঁপানো। তামাচে- চড় মারা। ইলপে-সম্মানে। গেহ্‌রা-গভীর। রিহা- রেহাই দেওয়া। ক্যায়াদ- বন্দী করা। জাঞ্জির- বেড়ি, শিকল। তাড়াপ- ছটফট করা। মজবুর- দুর্বলতা। ইরাদে- ইচ্ছা। দিলশাহে ওয়ালা- বড় মনের অধিকারী।

সাহারা কি রোতি আন্ধিয়া

সাহরা কি রোতি আন্ধিয়া পার্দে কে লিয়ে আয়ি,
দামান মে সাথ আপনে বাস আহ ও ফুঘান লায়ি।

হার মা কি হে তামান্না বাতে কা দেখে সেহরা,
আফসোস কে হাসরাত নে ইয়ে কেয়সি আনি খায়ি।

আব ওয়াক্ত হে মাগরিব কা হার সিমত্‌ হে সান্নাটা,
দরিয়ে কি মওজ আব তো রোনে পে উতার আয়ি,

কারবাল কে বিয়াবান মে রোতি হে কোয়ি দুখিয়া

আব কোয়ি নেহি উসকা ইয়ে কেয়সি হে তানহায়িয়া

কারবাল কে মুসাফির কো পানি না দিয়া জায়ে,

কে কেয়সি থি মুসালমান ইয়ে কেইসি বেহায়ায়ি

পির ও জাওয়ান ও বাচ্চে কুরবান হো গায়ে সাব,

নামোসে এ মুস্তোফা পার আফাত কি ঘাটা ছায়ি,

ইয়ে রাব বাধা দে হিম্মাত দিল মুহ্ কো আ গায়া হে,

কিস কিস কো লিখ্খে ওয়াসেক কিস কিস কো কাজ্বা আয়ি।

-সায়েদ ওয়াসেক বাহাদুর ওয়াসেক

ভাবার্থ

হোসেন পরিবারের মাঝ মরুভূমিতে সাহায্যের করার মত কেউ নেই, চারিদিকে অন্ধকার। প্রত্যেক মা তাদের সন্তানদের স্বাভাবিক জীবন দিতে চান, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সকল পুত্র সন্তানদের মৃত্যু হয়েছে। মগরিবের এই সময়ে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে আছে, নদীর প্রতিটি তরঙ্গ কারবালার দুঃখের কাহিনি প্রকাশ করছে। মরুভূমির মধ্যে একাকীনি বসে আপনজন হারিয়ে সকলে কাঁদছেন, এই দুঃসময়ে কেউ তাদের সঙ্গে নেই। কারবালায় কোনও পিপাসার্তদের জল দিয়ে সাহায্য করা হয়নি। হোসেনের সম্মানে বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলে আত্মত্যাগ করলেন। সকল স্বজনহারাদের জন্যে কবি প্রার্থণা করছেন যেন তারা এই অসহনীয় কষ্টকে সহ্য করার ক্ষমতা রাখেন।

শব্দার্থ

ফুঘান- বিলাপ করা। বিয়াবান- মরুভূমি। নামোসে- সম্মানীয়

হাশ্‌র কারবালা কে

চারচে রেহেঙ্গে লাব পার হাশ্‌র কারবালা কে

সার কাট গেয়ে জাহান পার অউলাদ মুস্তাফা কে।

হা দেখ লে অ্যায় হুরমুল আসগার কি ভি শুজা'আত

ফির না কই-ই মারেগা ইস তারহা মুসকুরাকে।

শাব কি বিহায়ি দুলহান লাশে পে রো রেহি থি

রুখ ভি বালায়ে লেকার ঘুঙ্ঘাট পে মু(হ) ছুপাকে।

বালোসে মু(হ) ছুপায়ে কিস ইয়াস সে চালি থি

কুফে সে শাম জয়নাব বে মাকনা-ও-রিদা কে।

কেহতে হে ফাথ'আ কিস কো আফাক কারবালা মে

শাব্বির মে দিখায়া সাজদে মে সার কাটাকে

-আফাক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

কারবালার টুকরো টুকরো কাহিনিকে কবি এই কবিতার মধ্যে গেঁথেছেন। কবি বলছেন হাশর অর্থাৎ পৃথিবীর শেষ দিন অবধি কারবালার কাহিনি সকলের কাছে বেঁচে থাকবে। কারবালা স্থান যেখানে রাসুলের সবচেয়ে প্রিয় হোসেন শিরোচ্ছেদ করা হয়েছিল। আসগারের প্রাণহন্তাকারী হুরমূলকে কবি বলছেন যে এই শিশুটি যে ভাবে হাসিমুখে মৃত্যুবরন করেছেন তার নজির দুনিয়তে আর নেই। সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী[৬৮] তার স্বামীর মৃতদেহের পাশে মুখ লুকিয়ে কাঁদছেন। নিজের কেশ দ্বারা মুখ ঢেকে শাম থেকে কুফা নগরীর দিকে চলেছেন। কবি

[68] হাসান পুত্র কাসিমের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী কুবরার বিধবা হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি কবি ব্যবহার করেছেন।

আফাক মনে করেন। সাব্বির বা ইমাম হোসেন নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সকল মুসলিম বিশ্বে জয়লাভ করার নতুন সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করলেন।

শব্দার্থ

চারচে-আলোচনা। হুরমুল- হুরমুল একটি চরিত্র যে শিশু আলি আসগারের গলায় ফোরাত নদীর কাছে তীর মেরে হত্যা করে। শুজাআত- অসীম সাহসী। সাজদে- আল্লহের স্মরণে অবনত হওয়া। ফাথ-আ- জয়লাভ করা। বেমাক্বনা- বেপর্দা। রিদা- চাদর।

শাব্বির তেরে গাম মে

শাব্বির তেরে গাম কো ভুলায়ে না জায়েগা
নাক্‌শে-এ- হুসেন দিল সে মিটায়ে না জায়েগা

কারতা হে জো হুসেন কা মাতাম জাহান মে
দোজখ কি আগ মে বো জালায়ে না জায়েগা

পানি দিয়া না জিস নে শাহ-এ-মাশরাকেন কো
কওসার কা জাম উস কো পালিয়া না জায়েগা

মাশক্‌-এ-সাকিনা ছিদ গেয়ি নাজরো কে সামনে
পেয়াসি কো হায়ে পানি পিলায়া না জায়েগা

নানহি সি কাব্‌র খোদকে শাব্বির নে কাহা
আসগার কো অর ঝুলা ঝুলায়ে না ঝুলায়ে

অ্যায় আশক্ হে নিজাত কি কাশতি ইয়ে আহ্ল-এ বায়াত

ইনকে বেঘির খুল্দ মে যায়া না যায়েগা

-সাগির হোসেন আশক্ মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এই কবিতার মধ্যে দিয়ে হোসেনের বিচ্ছেদে কবি নিজের মনের বর্ণনা করেছেন। শাব্বিরের মৃত্যুর শোক কবির মন তথা সকল হোসেনপ্রেমীরা মন থেকে কখনো মুছে ফেলতে পারবেন না। যারা দুনিয়াতে হোসেনের নামে মাতম করবে তাদের কখনো নরকের আগুনে পুড়তে হবেনা। ইহলোক ও পরোলোকের বাদশা হোসেন পরিবারেরকে যারা তৃষ্ণার্ত রেখে অত্যাচার করেছেন তাদের শেষ দিনে রাসুলের দ্বারা বন্টিত কাল-কওসারের[69] পানি খাওয়ানো হবেনা। যাদের চোখের সামনে সাখিনার জলের পাত্রটি ছিন্ন করা হয়েছে, এবং পিপাসার্ত কে জল দেয়নি তাদের জন্যে পরকালে আছে অনন্ত শাস্তি। ইমাম হোসেন যখন শিশু আলি আসগারের কবর খুঁড়লেন তখন পুত্রশোকে কাতর হয়ে বললেন, তার পুত্রকে আর কখনো ঝুলাতে ঝোলানো হবেনা। কবি সকলকে জানাচ্ছেন রাসুলের পরিবারের প্রতি প্রেম ভিন্ন কারো পক্ষে বেহেশ্ত পাওয়া সম্ভব নয়।

শব্দার্থ

শাব্বির- হোসেন এর একটি নাম। শাহে মাশরাকেন- দুই জাহানের বাদশা, অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের বাদশা। মাশ্ক-এ-সাখিনা- সাখিনার জলের পাত্র। ছিদ গেয়ি- ছিন্ন হয়ে গেল। নানহিসি- নিষ্পাপ শিশু। খোদকে- খুঁড়ে। নিজাত- মুক্তিলাভ করা। কাশতি- নৌকা। বেঘির- ছাড়া, ব্যতীত। খুল্দ- জান্নাত বা স্বর্গ।

কারবালা সে কুফে

কারবালা সে কুফে কো ক্বাফলা জাতা রাহা,

শাহ-এ- দিন কা নাম লাব পে বার্হা আতা রেহেগা।

[69] কওসারের পাণি অর্থে বোঝানো হয়েছে যে হাশরেরর মাঠে যখন সকলে জেগে উঠবে , তাদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকাকালীন রাসুলের আদর্শে চলে সুপথ অবলম্বন করেছিলেন, তাদের কওসার নামক এক স্বর্গীয় জল দিয়ে পিপাসা নিবারণ করা হবে।

পাবা জাঞ্জির অর গালে মে তাওক্ব-এ-আহান খারদার

লাড়খাড়াতা থনকারে খাতা চালা যাতা রাহা।

কৌন দেখে সায়েদ-এ-সাজ্জাদ কা আব হাল-এ-জার

গাশ পে গাশ হার হজার ক্বাদাম পে আপকো আতা রাহা

জুল্‌ফ সে চেহ্‌রে কও দানপে হোঁঠো পার সাইদানিয়া

লুট নে কে আহ্‌ল-এ-হারাম কা ক্বাফ্‌লা জাতা রাহা

খুন কে আঁসু সে বেদিল অর গাম-এ শাপ্পার সে

জাব উঠা নালা ত দিল কও অর ভি তাড়পাতা রেহে

-বেদিল মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এই নহাটি কবিতে হোসেন পরিবারের সকলকে হত্যা করার পর যে নারীরা ও অসুস্থ আবীদ বেঁচে ছিলেন তাদের বন্দী করে যখন এজিদের দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কবি নিজ জবানি তে সেই চিত্র বর্ণিত করছেন।

পায়ে বেড়ি, গলায় কাঁটাযুক্ত মালা পরিয়ে হোসেনের পরিবারকে একসঙ্গে কারবালার থেকে কুফার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হোসেন পুত্র আবীদের যন্ত্রণা নিয়ে কেউ চিন্তিত নয়, বার বার তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ছেন। নারীরা সকলে চুল দিয়ে মুখ নিজেরদের আব্রু রক্ষার চেষ্টা করছেন। কবি বেদিল তাদের কষ্ট নিজের মধ্যে অনুভব করে ভিতরে ভিতরে তড়পাচ্ছেন।

শব্দার্থ

বারহা- বারবার। পাবা- পায়ে। জাঞ্জির- বেড়ি। তাওক্বে-আহান- লোহার বলয়। খারদার- কাঁটাযুক্ত। থনকারে- পদস্খালন হওয়া। সায়েদ-এ-সাজ্জাদ- হোসেন পুত্র জয়নুল আবেদীন। হালে-জার- বর্তমান অবস্থা। গাশ পে

গাশ- বার বার অচৈতন্য হয়ে পড়া। জুল্‌ফ- লম্বা কেশ। সাইদানিয়া- মহম্মদীয় বংশের নারীরা বা সায়েদা। বেদিল- দয়া নেই যার। শাপ্পর- হোসেনের একটি নাম, শাপ্পির ও সাব্বিরও বলা হয়ে থাকে। জাব উঠা নালা- কষ্টে হৃদয়ে যখন মোচড় দিয়ে ব্যথা অনুভূত হয়।

কারবাল মে শাহ মুনিস

কারবাল মে শাহ মুনিস-ও-ইয়াওার লিয়ে হুয়ে
আয়ে বাচানে দিন ভারা ঘার লিয়ে হুয়ে

বিখরে পাড়ে হে দাশ্‌ত মে টুকড়ে ইয়াতিম কে
জায়ান হুসেন খ্যায়মে মে কিউকার লিয়ে হুয়ে।

বলি খুদা কো সোঁপা তুমহে যাও মেরে লাল
আঁখো মে আশ্‌ক জয়নব-এ-মুজতার লিয়ে হুয়ে

বলি ওয়াহা কে শাহ কো বাঁচায়েগা কৌন আব
বো দেখো শিম্‌র আতা হে খাঞ্জার লিয়ে হুয়ে

জয়নব-সাম্ভাল মাদার-এ কাড়েয়াল জাওয়ান কো
আতে হে শাহ্‌ লাশা-এ- আকবর লিয়ে হুয়ে ।

পানি দিয়া না বাচ্চি কো শিম্‌র-এ-লায়ি নে
পুছা মাগার টামাচা সিতামগার লিয়ে হুয়ে।

দারিয়া পে তাড়পা লাশা-এ-আব্বাস ঊস্‌ ঘাড়ি

যাব আয়া শিম্‌র বাহ্‌ কি চাদার লিয়ে হুয়ে।

আফসোস সার বারহানা হে আহ্‌ল-এ-হারাম নাজাফ

কাম জার্‌ফ হায়ে ফিরতে হে দারদার লিয়ে হুয়ে

-নাজাফ মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

হোসেন যখন তার পরিবার ও সহসঙ্গীদের নিয়ে সত্যের পথ প্রতিষ্ঠার জন্যে কুফার দিকে রওনা হয়েছেন সেখান থেকে এই নহাটি শুরু হয়েছে। এখানে গোটা কারবালার ঘটনাটিতে কবিতার মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। সকলে কুফার পথে রওনা হয়েছিলেন দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্যে। কিন্তু তাদের সে স্বপ্ন সফল হয়নি। তাদের দেহের টুকরো গুলি কারবালার ময়দানে অনাথের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। জল চোখে ভরা চোখে জয়নব তার সন্তানদের যুদ্ধে সমর্পন করে দিয়েছেন। সিমর্‌ তরোয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হোসেনকে হত্যা করা অপেক্ষায়। আলি আকবের মৃত দেহ দেখে মা লায়লা নিজেকে সামলাতে পারছেন না, জয়নব তার ভাইয়ের স্ত্রী লায়লাকে সামলাচ্ছেন। ফোরাত নদী আটকে রাখার মূল কুচক্রান্তকারী হলেন সিমর্‌, সে পিপাসার্ত বাচ্চাদের প্রতিও দয়া করেন নি। বাচ্চারা জলের জন্যে অনুরোধ করলে তাদের চপেটাঘাত করে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এখনো আব্বাসের লাশ পড়ে আছে নদীর কিনারায়। এত অত্যাচারের পরেও শীর্ণ, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হোসেন পরিবারের নারীদের বেপর্দা করে বন্দী করে পথে বের করেছেন।

শব্দার্থ

মুনিস-সাথী। ইয়াতিম- অনাথ। মাদার- মা। মুজতার-দুখী । মেরে লাল- চোখের মণি। সোঁপা- সমর্পিত করা। শিমর্‌- এজিদের সৈন্য,যার হাতে হোসেনের মৃত্যু হয়। সার বারহানা- কাপড় দ্বারা অনাবৃত মাথা। কাম জারফ- বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়া।

দরবারে ইয়াজিদ মে

দারবার-এ-ইয়াজিদ মে জো জয়নব কুলে সার হে

অ্যায় শামিয়ো ইয়ে ফাতিমা কি লখ্ত-এ-জিগার হে

আফসোস মুসলমানো তুমহে আয়ি না গেইরাত

বাজার মে ফিরতে হো নবি কে লিয়ে ইতরাত

হে খওফ পায়াম্ববার কা না আল্লাহ কা ডার হে।

লেহ্জে মে আলি মওলা কো জো খুত্বা শুনায়ে

থা জোর-এ-বায়ান এয়েসা কে দারবার হিলায়ে[70]

হায়দার কি জালালাত কা ইয়ে জয়নাব পার আস্র হে

সাজ্জাদ কো জাঞ্জির মে জাকতে হে সিতামগার

হাম্রাহ ফুপিজান কে কেইদি বানা বিমার

বেওয়াতানো কা কারবাল সে সুয়ে শাম সাফার হে

ঘার জানে সে মাহ্রুম রেহি হায়ে সাকিনা

জিন্দান মে দম তোড় গেয়ি হায়ে সাকিনা

আব মা কে লিয়ে কই না দুখতার না পিসার হে

জয়নাব নে কি নানা কে রোওজে পে শিকায়াত

[70] এখানে রাসুল পরিবারের যারা জীবিত ছিলেন তাদের এজিদের দরবারে বন্দী করে নিয়ে আসা হলে আঠেরো ঘন্টা অপেক্ষা করা পর এজিদ সকল বন্দীদের মুখে তাদের পরিচয় জানতে চায়। সেখানে জয়নব তার পরিচয়ে এজিদের দরবারের দাঁড়িয়ে দৃঢভাবে বক্তব্য রাখেন। তার সেই বক্তব্য আজও সংরক্ষিত আছে যা 'জয়নবের ভাষণ' বলে পরিচিত। তখন যে ভাবে বক্তব্য রাখে তার বাচনভঙ্গী এমন ছিল, তার মধ্যে সকলে তার পিতা হজরত আলির প্রতিচ্ছবিকে দেখতে পাচ্ছিলেন। তার বক্তব্যে সভায় থাকা প্রত্যেকে বিমোহিত হয়ে যান। যারা রাসুলের বিরোধিতা করে ছিলেন তাদের বেশির ভাগ নিজের ভুল বুঝতে পারেন, এবং এজিদের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কবিতা জয়নবের বয়ানের বা বাচনভঙ্গীর যে জোর ছিলো সেই প্রসঙ্গকে এখানে জোর-এ-বয়ান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বেপারদা কিয়া হামকো দি জালিম নে আজিয়াত

সো দাগ হে অউর এইক ইয়ে জয়নাব কা জিগার হে

জাইনাব কি মুসিবাত কো নাক্কাম কারতা হে রওনাক

সার পিট কে রোতা হে ইউ গাম কারতা হে রওনাক

জয়নাব তেরে মাতাম মে হি দিন রাত বাসার হে

-আমজাদ হুসেন রওনাক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

বন্দীদশায় থাকা অবস্থায় ফাতিমা কন্যা জয়নবের বর্ণনা দিয়ে তার স্তুতি রচনা করেছেন কবি। এজিদের দরবারে ফাতিমার ঘরের লক্ষী পর্দানোশীল জয়নবকে বেপর্দায় উপস্থিত করা হয়। কবি কিছু সংখ্যক মুসলিমদের হয়ে আফসোস করে বলেছেন, সেই মুসলিমদের লজ্জিত হওয়া উচিৎ যারা নারীর সম্মান সর্বোপরী রাসুলের ঘরের গৌরবকে পথে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। এ হেন কাজ যারা করেছে তাদের না আছে রাসুলের ভয় না আল্লাহর ভয়। যে আলির গৌরবে গোটা আরব গৌরাবান্বিত হয়েছে , জয়নব সেই আলির কন্যা, পিতা আলির সমস্ত গুণ তার কন্যার মধ্যে বর্তমান। এজিদের দরবারে মমতায়ী জয়নবের মধ্যে এক সংহারিনিকে খুঁজে পেয়েছেন কবি। জন্মভূমি মাদিনাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না তার কন্যাসম সাখিনাকে। হোসেন পরিবারের একমাত্র প্রদীপ সাজ্জাদ বা আবীদও জঞ্জীরবদ্ধ। শোকে জর্জরিত সাখিনাকেও তিনি হারালেন কারাগারে। এখন সাখিনার মায়ের দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার জন্যে না পুত্র না কন্যা বেঁচে আছে। বেঁচে থাকার সমস্ত আশ্রয় লায়লার থেকে কেড়ে নেওয়া হল। বিবি জয়নব তার পিতৃব্য রাসুলের কাছে তাদের সঙ্গে হওয়া একের পর এক অন্যায়ের অভিযোগ করে চলেছেন। তিনি জানাচ্ছেন এজিদের অঙ্গুলি হেলনে সৈন্যরা তাকে বেপর্দা করে মানসিক ভাবে ও শারীরিকভাবে যারপরনাই যন্ত্রণা দিয়েছেন। জয়নবের সারা শরীরে শত শত প্রহারের চিহ্ন সেই জুলুমের সাক্ষী দিচ্ছে। সেই সময় কবি রওনাক জয়নবকে কোনও প্রকার সাহায্য করতে পারেননি। জয়নবের দুঃখে কবির বুক চাপড়িয়ে বিলাপ করে তার সারা দিন রাত কেটে যাচ্ছে।

শব্দার্থ

কুলে সার হে- আব্রুহীন, মাথা ঢাকা না থাকা। শামিয়ো- আলো। লখ্ত-এ-জিগার- অন্তিম আশা। গেইরাত- লজ্জা। ইতরাত- বংশ। লেহজে- সুর, কথা বলার ধরণ। খুতবা- স্তুতি করা। জালালাত- আক্রোশ। হামরাহ- সহচর্য। বেওয়াতানো- দেশ ছাড়া যারা। দুখতার-কন্যা। পিসার- পুত্র। আজিয়াত- অনেক যন্ত্রণা দেওয়া। নাকাম- ব্যর্থ। বাসার- কাটে যাওয়া।

কাহানি বাহাত্তর কা

এককা গাম নেহি বাহাত্তর কা

কৌন না দিল টুট যায়ে সারাওয়ার কা

আসর্ তাক রাণ্ মে রোজ-এ- আসুরা

ঘার কা ঘার লুত গেয়ে পায়াম্বার কা

কারবালা মে রাসুল কা কুনবা

রাহা মুহতাজ এক চাদার কা

যাতে যাতে হুসেন ইবন-এ-আলি

লে গেয়ে দিল মে দাগ আসগার কা।

লে চালে যাব হুসেন আসগার কো

বাস খুদা হি থা ক্বাল্ব মাদার কা

তীর সে ছেদি গারদান-এ-আসগার

হুরমুলা তেরে দিল থা পাত্থার কা

-সায়েদ আবরার হুসেন মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

কারবালার দুঃখ একজনকে হারানোর দুঃখ নয়, বাহাত্তর জন শহীদের জন্যে এই দুঃখ। মহরমের ১০ তারিখে বিকেল বা আসর্[৭১] অবধি চলল কারবালার যুদ্ধ। এর মধ্যেই রাসুলের পরিবার উজাড় হয়ে গেল এজিদের হাতে। কারবালায় রাসুলের প্রাণপ্রিয়রা এখন কাফনে ঢাকা। মৃত্যুর সময় হোসেন তার পুত্র হারানোর শোক বুকে করে নিয়ে গেলেন। হোসেন যখন তার পুত্রকে মায়ের কোল থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, মা রুবাবের মনের যে অবস্থা সেই যন্ত্রণা থেকে একমাত্র আল্লহই তাকে মুক্তি দিতে পারেন। যে হুরমূলা ছয় মাসের শিশুর নির্দয়ভাবে প্রাণহরণ করে মায়ের কোল খালি করেছে, তার মন পাথরের সমান।

শব্দার্থ

সারোওয়ার- দলপতি, অধীশ্বর। কুনবা- সন্তান-সন্ততি। মুহতাজ- অনুপায়, অনাশ্রয় । ক্বল্‌ব- হৃদয়। গারদান- গলা। হুরমুলা- শিশু আলী আসগারের হত্যাকারী হুরমুলা।

প্যায়াসে কি কাহানি

মজলুম কি বেকাসো কি প্যায়সে কি কাহানি হে,
বেশির কা লাশা হে অউর তিষনা দাহানি হে।

লিপ্টা কে কালিজে সে মওলা নে কাহা রো কার
কাসিম কা ইয়ে লাশা হে ভাইয়ি কি নিশানি হে।

আকবর জো চালে রণ কো জইনাব নে কাহা রো কার
আল্লাহ নিগাহেবান হো আহমেদ কি জাওয়ানি হে।

[71] ইসলামি প্রার্থণার প্রথান অঙ্গ নামাজ, দৈনিক ও আবশ্যিক পঠিত ৫ বার নামাজের বিকালের তৃতীয় নামজের সময়কালকে আসর্ বলা হয়েছে।

মাশকিজা লাব-এ-দারিয়া দেখা জো সাকিনা নে
মাদার সে কাহা রো কার আম্মু কি নিশানি হে।

মিল গেয়ে জো আদাসে লে যাও মাক্বতাল
হে তিষনা দাহান ভাইয়ি এক বুন্দ পিলানা হে।

কানো সে ছিনে গওহার রুখসার হুয়ে জাখমি
বাবা হো কাহা আও রুদাদ শুনানি হে।

বেচ্যান নাসিম আব হে কারবাল মে বুলা লিজে
রওজেপে মেরে মওলা কুছ আপনি শুনানি হে।

-সায়েদা নাসিম আরা বেগম

ভাবার্থ

নিষ্পাপ, অসহায়, অত্যাচারীতের কাহিনি হল কারবালা। শিরহীন মৃতদেহ এবং তৃষ্ণার্তদের কাহিনির সঙ্গে যুক্ত কারবালা। কাসিমের মৃত দেহকে বুকে জড়িয়ে হোসেন বলছেন যে, কাসিম তার বড় ভাইয়ের একমাত্র স্মৃতি, তাকেও পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল। আকবঅর যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাচ্ছেন তখন জয়নব চোখের জলে তাকে বিদায় দিচ্ছেন, কারণ তিনি জানেন হোসেন পুত্র আকবরকেও তিনি হয়ত অন্তিম বার দেখছেন। সাখিনা নদীর পাড়ে পড়ে থাকা জলের কুঁজ দেখতে পেয়ে সে তার মাকে এসে জানায় সে তার চাচাও হয়ত আর বেঁচে নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে যারাই গেছে তাদের মিখে একটিই কথা কেউ গিয়ে যেন ছোটো শিশুদের কয়েক ফোটা জল দান করে করে আসেন। নারীদের কান থেকে পরিহিত অলঙ্কার গুলি টেনে ছিঁড়ে আনা হয়েছে, প্তিবাদ যখনই তারা করেছেন কারণে অকারণে চপেটাঘাত করা হয়েছে, সেই কারনে তাদের গালে আঘাতের চিহ্ন খোদিত হয়েছে। এই সময় অসহায় নারীরা তাদের পিতা বা স্বামীকে মনে করে তাদের আহ্বান জানাচ্ছেন অন্যায়ের

বৃত্তান্তটি শোনাবে বলে। কবি নাসিম তাদের কথা ভেবে এতটাঈ চিন্তিত যে তিনি তাদের কাছে উপস্থিত হতে চান, এবং তাদের হয়ে তিনি আলির কাছে সুপারিশ করতে চান।

শব্দার্থ

তিষনা দাহানি- পিপাসায় শুকনো জীহ্বা। বেকাসো- নিরপরাধী। নিগাহেবান- যিনি রক্ষা করেন। বেচ্যান- অস্থির হয়ে পড়া। দারিয়া-নদী। গওহার- কানের অলঙ্কার। রুখসার- গাল। রুদাদ- বৃত্তান্ত, হাল, কাহিনি।

নাদান আলি আসগার

আসগার-এ-নাদান শির খার
মা তেরে সুরাত কে নিসার
চান্দ গালে লাগজা এক বার,
মা তেরে সুরাত কে নিসার।

অ্যায় মেরে চান্দা ঝুলে ঝুলাউ,
লরিয়ো দে কার মে তুঝকো সুলাউ
তেরে হে কাবসে ইন্তেজার,
মা তেরি সুরাত কা নিসার।

কিসকো সুনাউ তেরি কাহানি,
ক্বাতরা না তুনে পায়া না পানি,
প্যায়াস বুঝায়ি তির মার,
মা তেরি সুরাত কা নিসার।

পাওউ কাভি না ঢুন্ডকে তুঝে।

চ্যান কিসি পাল আয়ে না মুঝকো,

ফিরতি হে সুরাত বার বার

মা তেরি সুরাত কে নিসার।

আ জা তুঝে আঁখো মে ছুপালু,

চুম লু মুখড়া দার্দ মিটালু,

কাব সে ইয়ে মা বেকারার

মা তেরি সুরাত কা নিসার।

ঘুটনিয়ো চাল কার আ মেরে প্যারে

মা কে সাহারে চ্যান হামারে,

কারতি হু মিন্নাত বার বা

মা তেরি সুরাত কা নিসার।

রোওজে পে তেরে মেরে ও মওলা

আহ্ নাসিম-এ-খাস্তা কো মওলা

জাল্দ বুলাও একবার,

মা তেরি সুরাত কে নিসার।

-সায়েদা নাসিম আরা বেগম

ভাবার্থ

এই নহাটি পুরোটাই শিশু আলি আসগারকে কেন্দ্র করে। বলা যেতে পারে এই কবিতার রচয়িতা যেহেতু একজন নারী সেহেতু আসগারের মা রুবাবের মনের অবস্থার তার কাছে খুব সহজেই ধরা পড়েছে। মাতৃত্বের

স্বাদ যিনি পেয়েছেন তিনি সন্তান হারানোর যন্ত্রণাকে খুব ভালো ভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। এই নহাটি তিনি এক মায়ের সন্তানকে কেন্দ্র করে ছোটো ছোটো অনুভূতি গুলিকে রুবাবের যবানিতে বসিয়েছেন।

আলি আসগার সে মায়ের চোখের মণি, তার মুখের দিকে চেয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করার মধ্যে রুবারের বেঁচে থাকার সার্থকতা। তিনি তার কোলের শিশুকে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াতে চান, তাকে ঝুলায় ঝুলিয়ে নিষ্পাপ হাসি দেখে মন ভরাতে যান। রুবারের মনের দুঃখ শোনার মত কেউ বেঁচে নেই। যেখানেই তিনি তার সন্তানকে খুঁজতে যাননা কেন কোথাও তিনি আসগারকে খুঁজে পাবেন না। বারবার তার আদরে ভরা মুখটি ভেসে উঠছে। আসগার যেখানেই থাকুক তাকে তার কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, ফিরে পেলে রুবাব তার ছোট্ট শরীরটিতে চুম্বনে ভরিয়ে দেবেন। আলি আসগারকে দেখতে পেলেই তার মনের সমস্ত যন্ত্রণা নিমেষে চলে যাবে। হামাগুড়ি দিয়ে আসগার যে ভাবে মা-এর বুকে আসে সেই ভালোবাসার সম্পদ ইহজগত ত্যাগ করেছে। তাকে হত্যা করা হয়েছে, সন্তানের এমন মৃত্যু রুবাবের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে কেড়ে নিয়েছে।

শব্দার্থ

শিরখার- ছয় মাসের। নাদান- অবুঝ। নিসার- যার জন্যে সব কিছু ত্যাগ করা যায়। লরিয়ো- ঘুমপাড়ানি গান। সুরাত- মুখ। বেকারার- অস্থির। সাহারে-সঙ্গ। মিন্নাত- কিছু চাওয়া। খাস্তা- টুকড়ো । জল্‌দ- শীঘ্রই । বুলাও- আহ্বান করা । মুখড়া-বদন, মুখ।

লুট গায়ে আল-এ পায়াম্বার

১

গাম উঠানে কো রেহ্ গেয়ি জয়নব

জিতেজি হায় মার গেয়ি জয়নব

লিজিয়ে আব মেরি খাবার বাবা

২

ভাই আব্বাস হে না আকবর হে

পার কাসিম হে না তো আসগার হে

হাম পে হাসতে হে অ্যাহলেশার বাবা

৩

নোকে ন্যাজে পে হে হুসেন কা সার

জিসমে ওরিয়া হে গারমি রেতি পার

চাল বাসে রুহে পায়াম্বার বাবা

৪

হাম কো তুফানে গাম নে ঘেরা হে

আব ত নজরো মে বাস আন্ধেরা হে

রাহ্ আতি নেহি নাজার বাবা

৫

ক্যায় বাতাউ ইয়াহা জো আলাম হে

সারে খ্যায়মু মে শোরে মাতাম হে

হামসে রুঠা হে মুক্কাদ্দার বাবা

৬

আবতো চালতা নেহি কালাম আশিক

রেহ্ গেয়ি হাশ্‌র তাক য়ে গাম আশিক

রোকে কেহতি থি ওহ্ মুযতার বাবা

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এই নহাটি জয়নবের যবানিতে লেখা হয়েছে। রাসুলের পরিবার একেবার শেষ হয়ে গেল। এই ধ্বংসলীলার সাক্ষী ছিলেন হোসেন দুহিতা জয়নব। সমস্ত দুঃখের ভার তাকে একা বয়ে বেড়াতে হবে এখন থেকে। একই সঙ্গে সকল আপনজনকে হারিয়ে বেঁচে থেকে তার মৃত্যু হয়েছে। ভাই আব্বাস ও হোসেন নেই, সন্তান সম

কাসিম, আকবর, আসগারকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে তারা কেউ এখন জয়নবের পাশে নেই। এখন তার দুঃখে কুফাবাসীরা হাসাহাসি করছে। জয়নব এমন পরিস্থিতে একা সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করছেন। তপ্ত মরুতে তাদের তৃষ্ণার্ত করে রাখা হয়েছে, হোসেনের শিরোচ্ছেদ করে বল্লমের মাথা গেঁথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা যেন এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবাতের মধ্যে পড়ে গেছেন, যেখানে শুধু অন্ধকার, মুক্তির কোনো পথ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। এমনি অবস্থা যেন নিয়তির কোপ তাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে।

বিবি জয়নবের দুঃখের কথন বর্ণনা করা কবি আশিকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। কবি মনে করছেন জয়নবের দুঃখ হাশর্ অবধি সকলে মনে করে চোখের জল ফেলবেন।

শব্দার্থ

আল-এ-পায়াম্বার- রাসুলের পরিবার। জিতেজি- জীবদ্দশায়। অ্যাহলেশার- সকলে। ন্যাজে- অস্ত্র। রেতি- মরুর বালি । আলাম- অবস্থা, পরিবেশ। তুফান- ঝড় । ওরিয়া- হোসেনের পরিবার। মুকাদ্দার- ভাগ্য। রুঠা হে- রেগে থাকা। হাশ্র- বিচারের দিন। কলম-লেখনী। রোকে- কেঁদে।

জয়নব কি দুয়া

জয়নব ইয়ে দুয়া মাঙ্গি হাথো কও উঠাকার

ইয়ে রাব মেরে আব্বাস কো তু সাব্র আতা কার।

১

বাদলা হুয়া তেভার হে মাথে পে পাসিনা হে

হাথো মে আলাম ভি হে অর মাশকাতে সাকিনা হে

লাগতা হে কে আব গাজি কার দেগা বাপা

২

সাব্বির পারেশান হে ওয়াদা ভি নিভানা হে

ঘার বার লুটাকার ভি ইসলাম বাচানা হে

চামকে না কায়ি তেরে ওয়াফা যোশ মে

৩

কারতি হে বায়া(ন) খোহারে শাব্বির য়ে রোকার

নারগে মে লিয়া হামকো জাফাকারও নে আকার

আয়ে না কায়ি ঘিয়াস মে আব্বাস দিলাবার

৪

মওযো মে তালা তুম হে ইয়ে খওফ হে

দরয়ায়ে না ফির দুনিয়া খ্যায়বার কি কাহানি [72]কো

হাম পার ইয়ে কারাম কারো কিজিয়ে অ্যায় খ্বালিকে একবার

৫

মাবুদ তেরি রাহ্ মে আকবর কো ভি দেঙ্গে

নান্হাসা মুযাহিদ আলি আসগার কো ভি

কার দেঙ্গে ফিদা হজরতে কাসিম কো সাজাকার

৬

মে অনও মুহাম্মাদ কো ভি কুরবান কারুঙ্গি

ভাই পে ফিদা আপনি দিল-জান কারুঙ্গি

লে জাউঙ্গি মে খাক-এ-বালা স্যার পে উঠাকার

৭

তারিখ মে মিলতি নেহি সানি তেরি বিবি

আশিকে নেহি লিখ্ পাতে কাহানি তেরি বিবি

বেতাব মানব্বর নে কাহা আশক্ বাহাকার

---

[72] মুসলিম এবং ইহুদিদের মধ্যে ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে খেয়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খেয়বারের ভৌগোলিক ভাবে মদিনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১৫০ কিমি দূরে বর্তমানে আরবীয় উপদ্বীপে অবস্থিত। সেই সময় খেয়বারে যে দূর্গটি অবস্থিত ছিল তার বিশালাকার সিংহদ্বারটির ৪০ জন দ্বাররক্ষী ছিলেন। দ্বার রক্ষার্থে ৪০ জন পালোয়ান নিয়োজিত ছিলো। হজরত মহম্মদ ইহুদিদের সঙ্গে এই যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ৪০ দিন ব্যাপী এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহুদীদের মধ্যে মারহাব ছিলেন সবচেয়ে মহান যোদ্ধা, তিনি অপরাজেয় বলেও বিখ্যাত ছিলেন। তার মাতামহ আলির সঙ্গে যুদ্ধের আগের রাতে স্বপ্ন দেখেন যে মারহাব সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হন। মারহাবকে সাবধানও করে দেওয়া হয়,কারণ তিনি বুঝেছিলেন হেয়দার নামে খ্যাত আলির সঙ্গে যুদ্ধে মারহাবের মৃত্যুর সম্ভবনা প্রবল। ঘটনাচক্রে মারহাবের মৃত্যু আলির হাতেই হয়।

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

জয়নবের যবানিতে এই নহাটি রচিত হয়েছে। এখানে জয়নবের আল্লাহপ্রীতিকে বিভিন্ন ভাবে দেখানো হয়েছে। জয়নব হাত তুলে আল্লাহর কাছে দুয়া বা প্রার্থণা করছেন যে তিনি যেন ভাই আব্বাসের ধৈর্যশক্তি বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আব্বাসের কপালে গরমে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, ও তার আচরণেও তফাৎ দেখা দিয়েছে। এক হাতে ইসলামি নিশান এবং অন্য হাতে সাখিনার দেওয়া জলের পাত্র। সাখিনাকে জল এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তাকে রক্ষা করতেই হবে। হোসেন চারিদিকে পরিস্থিতিতে অত্যন্ত শোকাহত এবং চিন্তিত। পরিনাম যাইহোক ঘর-পরিবার উজাড় করে হলেও তিনি ইসলামকে বাঁচাবেন। জয়নব কেঁদে বলছেন যে একা হোসেন যখন সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত তখন তাদের হয়ে কেউ সহায়তা করতে আসেননি। চারিদিকের অশনিসংকেতে জয়নব প্রার্থণা করেছেন তাদের সঙ্গে যা হয়েছে এই নির্মমতা যাতে পরবর্তিতে কেউ না দেখে। আল্লাহর এক নয় দুই নয় সকলকে তারা সমর্পণ করে দিতে পারেন। আলি আকবর, কাসিম, আসগার সকলকে তারা হাজারবার সমর্পিত করবেন, কিন্তু অন্যায়ের সামনে মাথা নত করবেন না। এই সময়ে জয়নবের মত নারীর উদাহরণ পাওয়া যাবেনা আর কবি আশিকের জয়নবের গুনাগুন লেখার মত যোগ্যতা নেই। জয়নবের দুঃখে অস্থির কবি চোখের জল ফেলে সেই মহান নারীকে মনে করছেন।

শব্দার্থ

খওহারে শাব্বির- শাব্বিরের বা হোসেনের বোন জয়নবের কথা বলা হয়েছে। নারগে- প্রতারনা করে বন্দী করে রাখা। মওয- তরঙ্গ। তালাতুম- জলস্ফীতি, জোয়ার। খ্যায়বার কি কাহানি- খেয়বারের যুদ্ধ। দোহ্রায়ে- পুনরায় করা। কারাম- রক্ষাকারী, শান্তিদানকারী। খ্বালিক- খোদা, ঈশ্বর। ফিদা- পাগলামো। কাসিম- হাসান পুত্র। নানহাসা মুজাহিদ- নিষ্পাপ যোদ্ধা। বালা- বিপদ। সানি তেরে বিবি- তার মত নারী। বিবি- সম্মানীয়া নারী। বেতাব- আকুল হওয়া। মানব্বর- হোসেন।

হাঙ্গামা য়ে মেহশার থা

হাঙ্গামা য়ে মেহশার থা সাকিনা কে বুকা মে

এ কাশ নেহি আতে হাম কারবোবালা মে

১

জাব কাফেলা বাবা কা মাদিনে সে চালা থা

ইয়ে আকবর-এ-জিশা মেরা আব্বাস চাচ্চা থা

হার হাল মে হুম শাদ্ থে পুর

২

গেহ্ভার আয়ে আসগার কি লিয়ে হাথো মে ডরি

জাবতাক ওহ্ না সোতে থে সুনাতি থি মে লরি

মে রেহ্ গেয়ি ওয়হ সো গায়ে আগোশ-এ ক্বাজা মে

৩

কারতে থে মুহম্মদ সে কাভি অনো সে বাতে

কাসিম সে কাভি অর কাভি জনো সে বাতে

খামোশ ওহ্ সাব হো গায়ে ইস দাশ্তে বালা মে

৪

এক আবিদ-এ বিমার হে এক জয়নব-এ লাচার

দিন-রাত সাতাতে হে জিন্হে কওমে সিতামগার

লেহরাতে হুয়ে কোড়ো-কো পুরশোজে ফিজা মে

৫

বেহতা হে লাহু কানো সে জাখ্মি হে গালা ভি

লাগতি হে গালে মে মুঝে আব সাঁস ভি ভারি

হে আখরি মাঞ্জিল মেরি ইস ক্যায়দে যাফান

৬

আরমান রাহা দিল মে সাকিনা কা ইয়ে আশিক

মাতাম কারো মাজলুমে সাকিনা কা য়ে আশিক

স্যার পিঠ কে রো মোমিনো পোশাকে সিয়ামে

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

সাখিনার যবানিতে রচিত এই নহাটিতে সাখিনা বলছে নিয়তি তাদের মহাবিপদের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে। নিঃস্ব ও স্বজনহারানোর আর্তি এই নহার পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। সাখিনা কেঁদে বলছে তারা কুফাবাসীর আমন্ত্রনের যদি মাদিনা ছেড়ে না আসত তবে, আপনজনের সকলে বেঁচে থাকতেন। গাজি আব্বাস তার প্রাণপ্রিয় চাচা, তিনি আর নেই। আসগারকে দোলনায় রেখে দড়ি ধরে দোল দিয়ে গান শুনিয়ে ছোট সাখিনা ঘুম পাড়িয়ে দিত। তার ভাইও মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে গেছে। কখনো মহম্মদ বা অন আবার কখনো বা কাসিম কিংবা জনের কাছে সাখিনা ছুটে যেত, মন খুলে গল্প করত, কিন্তু হায় তারা সকলেই মরুভূমির ঝড়ে পড়ে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে আছে। আবীদ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন, জয়নব অসহায় হয়ে পড়েছেন, যাকে দিন রাত অত্যাচারীর দল চাবুক দিয়ে প্রহার করে চলেছেন। কান থেকে সাখিনার রক্ত ঝরছে, পিপাসায় তার গলাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। গলার কাছে যেন তার প্রাণ আটকে বুক ভারি করে রেখেছে। সাখিনা বুঝতে পারছে তার এই কয়েদখানা থেকে মুক্তিলাভ করা হবেনা, এটিই তার অন্তিম ঠিকানা[73]। কবি আশিকের মনের বাসনা সমস্ত হোসেন প্রেমীরা কালো পোশাক পরিধান করে যেন সাখিনাকে নিয়ে বিলাপ করেন।

শব্দার্থ

হাঙ্গামা- শোরগোল। মেহশার- চারপাশের পরিবেশ। আকবরে জিশা- উচ্চ ভাবনার অধিকারী আকবর। শাদ্ থে পুর- একসঙ্গে থাকা। গেহভার- ঝুলা, দোলনা। ডরি- দড়ি। আগোশ-এ-ক্বাজা- মৃত্যুর মুখোমুখি। জন- হোসেনের এক সাথী। খামোশ- চুপ হয়ে যাওয়া। কওমে সীতামগার- অত্যাচারীর দল। আবীদ-এ-বিমার- কারবালার

[73] বিবি সাকিনার জন্ম আরবি মাসের ২০ রজব, ৫৬ হিজরিতে(৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ) , তিনি মাত্র চার বছর বয়সে এজিদের কয়েদখানায় বন্দীদশাতে প্রাণত্যাগ করেন (১৩ সফর,৬১ হিজরী, ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) ।

ঘটনায় একমাত্র হোসেনের অসুস্থ পুত্র আবেদীন বেঁচে ছিলেন। অসুস্থ থাকার কারণে তাকে বিমার-এ-আবীদ বলা হয়। এছাড়া সাজ্জাদ, আবেদীন নামেও ডাকা হয়। সাতাতে- যন্ত্রণা দেওয়া। লেহরাতে- ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। কোড়ো- চাবুক। পুরসোজে- আকুলভাবে ক্রন্দন করা, বিষাদে ভরা। ফিজা- বাতাসে। যাফান-অত্যাচারীদের বানানো কয়েদখানা। পোশাক-এ-সিয়ামে- কালো পোশাকে।

রন্ কি কাড়িয়াল জাবা

রণ কি জাব কাড়িয়াল জাবা থাম কার দিল শাহ বলে

পেহলে দু আকবর রাযা

রো দিয়ে কওম কা যাব কাহা ওহ ন'যাবা

আল্লাহ-হু-আকবার (৩)

খুন মে ডুবি আলি আকবর যাব আয়ি সদা

ইয়ে লাড়খাড়াতে সুয়ে মাখতাল চল দিয়ে শাহে হুদা

হায়ে আলি আকবর

পোহ'চ কার দেখা আলি আকবর কা শ্যানে হালেজার

সিনে মে বারচি গাড়ি হে দার্দ সে হে বেকারার

হায়ে আলি আকবর

সিনায়ে আলি আকবর বারচি কো নিকালে জাব হুসেন

ইয়ে শ্যায় কে খ্যায়মে সে উঠাবা আকবারা কা সোর ও শ্যায়

এই গুল হুয়া পাল্ভার মে ল্যায়লা কি উমিদো কা চিরাগ

ইয়ে রেহ গ্যায়া এক মা কে দিল মে হাসরাতো আরমা কা গাল

ইয়ে শ্যায় কি নাজ্‌রো মে হুয়ি তারিক আসিক কায়নাত

য়ে সার ঝুকা কে রো রেহে হে হুর -ও-গিল্মা এক সাথ

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এই নহার মধ্যে দিয়ে মূলত আলি আকবরের মৃত্যুর ঘটনাটিকে বর্ণনা করেছেন কবি। যুদ্ধের যাওয়ার পূর্বে নিজের আবেগকে ধরে রেখে হোসেন পুত্র যখন আযান দিলেন আল্লহর স্মরণে, তার আসন্ন মৃত্যুর কথা মনে করে এবং তার পরবর্তীতে নিজের পরিবারের ওপর আসন্ন বিপদের কথা ভেবে তার চোখের জল তার বাঁধ মানলোনা। এরপর যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পর তার পিতা আকবরের খোঁজে কম্পিত পায়ে যখন কারবালাতে গেলেন তখন দেখছেন বুকে বল্লম গাঁথা অবস্থায় আকবর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। এই অবস্থায় কাঁধে করে তার পিতা তাকে তাবুতে নিয়ে আসেন এবং যখনই তার বুকে গেঁথে থাকা বল্লমটি বের করে নিয়ে আসেন তখন সমগ্র তাবুতে কান্নার রোল ভেঙে পড়ল। একের পর এক রাসুলের পরিবারের ওপর বিপদ আছড়ে পড়তে লাগলো। ল্যায়লার আশার প্রদীপ মুহুর্তেই নিভে গেল। আকবরের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর মা ল্যায়লার মনের সমস্ত ইচ্ছার বিসর্জন ঘটল। আকবেরর শাহাদাতের সাক্ষী শুধু পৃথিবীবাসী নন। তার ত্যাগকে সম্মান জানাতে স্বর্গের ফারিস্তা ও অপ্সরারাও মাথা নত করে আছেন।

শব্দার্থ

রণ- যুদ্ধ। কাড়িয়াল যাবা-যুবক পুত্র। কওম-জাতি। শাহ্-সম্মানীয় অর্হে শাহ্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। থাম কার- ধরে থাকা। সদা- সবসময়। লাড়খাড়াতে- নিজের দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলা। সুয়ে- দিকে। মাখতাল- ময়দান । শাহে হুদা- ইমাম হোসেনএর অনেক গুলি নামের মধ্যে একটি। শোর-স্যানে- কান্নাকাটি। হালেজার- মনের অবস্থা। বারচি- বর্ষার মত অস্ত্র, বল্লম। খ্যায়মো-তাবু। গুল- উবে যাওয়া। হাসরাত- বাসনা, ইচ্ছা। উমিদো কি চিরাগ- আশার আলো। আরমা কা গাল- মনের কথা

মেরে ভাই আব্বাস

ইয়ে তামান্না-এ-আলি মেরে ভাই আব্বাস

মার ডালেগা হামে তেরি জুদায়ি আব্বাস

১

পানি লানা ভি জরুরি হে সাকিনা কেলিয়ে

গ্যাজ মে আকে না কারনা তু লাড়ায়ি

২

দেখ কার মাশ্ক-আলাম বলে হুসেন ইবন-এ-আলি

দিল তাড়াপনে লাগি অওর আঁখ ভার আয়ি

৩

পারদা-এ-জয়নব ও কুলসুম হে তুমসে কায়েম

লুট না যায়ে কাহি জেহ্রা কি কামাই-এ-আব্বাস

৪

বাদ তেরে আলি আকবর ভি চলে যায়েঙ্গে

ঘের লেগা হামে হারও সিম্ত তাবহায়ি

৫

কিউ কিয়া আসগার-এ মাসুম কো ভি তাষনা

খাতাম কার দেগা লেইনো-কে সিপাহি আব্বাস

৬

যাব সুনা বালি সাকিনা ইয়ে আলাম ঝুকনে লাগা

ওহ্ তাড়পানে লাগে অউর হোশ গাওয়ায়ি

৭

তেরে আকা কি ইয়ে আরমান হে অ্যায় রুহে ওয়াফা

আখরি দম মুঝে কেহ্ দিজিয়ে ভাই আব্বাস

৮

লুট জায়েঙ্গে অ্যাহ্‌লে হারাম বলিয়ে জয়নাব আশিক

কার দিয়া হাশ্‌র বাপা তেরি জুদাই আব্বাস।

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এই কবিতায় জয়নবের মুখে কবি শুনিয়েছেন তার ভ্রাতৃপ্রেমকে। আব্বাসকে যুদ্ধক্ষত্রে বিদায় দেওয়ার সময় জয়নব বলছেন, ভাই আব্বাসের বিচ্ছেদ তার কাছে মৃত্যুর সমান। কিন্তু শত্রুর মুখোমুখি তাকে হতেই হবে। সাখিনার জন্যে তাকে জল নিয়ে আসতে হবে। জয়নব ভাইকে পরামর্শ দিচ্ছেন যে, তিনি সবসময় মাথা ঠান্ডা রাখেন, অস্থির যেন না হোন। জয়নবের কথা শুনে গাজি আব্বাস জল ভরা চোখে জলের পাত্রের দিকে দেখলেন। জয়নব তার ভাইকে বলছেন তার এবং বোন কুলসুমের রক্ষার দায় তার ওপর নির্ভর করছে, বিবি ফাতিমার ভরা ঘর যেন লুট না হয়ে যায়। আব্বাসের চলে যাওয়ার পরে আলি আকবরও থাকবেনা তখন চারিদিক থেকে বিপদ-বালা ঘিরে ধরবে। আলি আসগারের মত শিশুকেও তারা জল না দিয়ে হত্যা করেছে, আব্বাসকেও সেই নির্মমের দল ফিরে আসতে দেবেনা। অলঙ্কারহীন সাখিনা পিপাসা সহ্য করতে না পেরে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। কবি আশিক বলছেন, আব্বাসের অবর্তমানের রাসুলের পরিবার ধ্বংসের মুখে পড়বে। আব্বাসের বিচ্ছেদ যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন সকলে মনে রাখবে।

শব্দার্থ

তামান্না- ইচ্ছা। জুদায়ি- বিচ্ছেদ। গ্যাজ মে- রাগান্বিত হওয়া। মাশ্‌ক-এ-আলাম- আলমের সঙ্গে মাশক বা জলের পাত্র। পরদা-এ- জয়নব- হিজাব রক্ষাকারী জয়নব। কায়েম- বহাল থাকা। জেহরা কি কামাই- বিবি ফাতিমা জীবিত থাকা কালীন যা যা অর্জন করেছিলেন। হার সিমত্‌- চারদিক। তাবহায়ি- ধ্বংস। সুনা বালি- অলঙ্কারহীন। গাওয়ায়ি- হারিয়ে ফেলা। হোশ- জ্ঞান। আলাম- পতাকা, ইসলামের নিশান। ওয়াফা- বিশ্বাস। রুহ- আত্মা। বাপা- মন্দ কিছু ঘটে চলেছে এমন। আহলে হারাম- রাসুলের পরিবার। লেইনো- জুলুমকারী

কারতি থি বুকা জয়নব অ্যায় অনো মুহাম্মাদ

কিস তারহা জায়ুঙ্গি আব অ্যায় অনো মুহাম্মাদ

১

দিল ধাড়কা হে সিনে মে মাক্বতাল

যাব কাতিলে হুয়ে তুম সব অ্যায় অনো মুহাম্মাদ

৫

অ্যায় আহমেদ কে ঘারানা সে রাখতে হে আদাওয়াত জো

সামঝায়েঙ্গে ভালা ওহ্ কাব ইয়ে অনো মুহাম্মাদ

৬

কিরদার-ও আমাল জিসকা পৌহচে দারো

কামিল হে ওহি মাঝহাব অ্যায় অনো মুহাম্মাদ

৭

আশিক পে কারাম কার দো শাব্বির কে সাদ্‌কে

হো রুহে রাসুল-এ রাব অ্যায় অনো মুহাম্মাদ

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

অন ও মহম্মদের মৃত্যুতে মা জয়নব কেঁদে বলছেন, তাদের ফেলে সে কিভাবে কারবালা ত্যাগ করবেন। যেই মুহুর্তে তাদের হত্যা করা হয়েছে তখনই সে হৃদয় মোচড়ানো ব্যথা অনুভব করেছেন মা জয়নব। রাসুলের ঘরানার সঙ্গে যারা বিদ্বেষ রাখে তারা কবে সঠিক পথে আসবে তা তিনি জানেন না। রাসুলের বলে দেওয়া পথে যারা চলেছেন তারা তাদের চরিত্র ও কর্মকে সংশোধন করতে পেরেছেন, এবং ধর্মের পথেও তারা জয়ী হতে পেরেছেন। অন ও মহম্মদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে কবি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থণা করেছেন।

শব্দার্থ

মাখ্বতাল- ময়দান। আহমেদ কে ঘরানাসে- রাসুলের পরিবারের সঙ্গে। আদাওয়াত- শত্রুতা। সামঝায়েঙ্গে- বোঝানো। কিরদার- চরিত্র। আমল- ক্রিয়াকলাপ। কামিল- পূর্ণ। মাঝহাব- পথ, মত। কারাম- দয়া। সাদকে- ওপর, প্রতি।

আলবিদা আলবিদা

রুহে আলি-আব্বাস এ জারি সে আ রেহি থি সাদা

আলবিদা আলবিদা আলবিদা

১

দিল কি তামান্নে রেহ্ গেয়ি দিল মে মেরে আকা হুসেন

রুহে গুলামে জার কো মওলা কেয়সি আয়েগি চ্যান

ওয়াদা ওয়াফা কারনে সে পেহ্লে আয়েগি হে ক্বাজা

২

হোনা খাফা আম্মু পার আপনি অ্যায় মেরে লাডলি

জুল্ম কি বাদলে সির পার ছায়ি তিরো কি বারিষ হুয়ি

মাশ্ক ছিদা অউর বেহ্ গেয়া পানি তুমসে না মে মিল সাকা।

৩

বাবা আলি কে লেহ্যে মে কারনা অ্যায় বেহেন গুফত্গু

দিন-এ-খুদা কি দাশ্ত-এ-বালা মে রাখনা বেহেন আব্রু

ওয়াদে হুসেন তাষ্ণা দাহান হো এক তুম হি না খুদা

৪

খুব দিয়া হে আজরে রিসালাত আপনে নবি কো মুসলমা

সিপতে নবি কো লুট কে আপনে ঘর কো কিয়া হে চিরাগা

হে ইয়ে মুসালমা দুশমান-এ মা ইনমে নেহি হে ওয়াফা

৫

জিকরে আলি আব্বাসে আশিক দেগি দুয়া ফাতিমা

জিনকে আলামসে হুর-ও-মালায়েক পড়তে রেহে মারসিয়া

আজ বহি আব্বাস কা মাতাম কারতে হে এহলে আজা

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

আব্বাসের মৃতদেহ থেকে যেন বিদায়ের সুর ভেসে আসছে। আব্বাসের মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল। ইহজগত ত্যাগ করে কি ভাবে তিনি পরোপারে শান্তিতে থাকতে পারবেন? সাখিনাকে জল এনে দেবার প্রতিজ্ঞা তার ব্যর্থ হয়েছে, প্রতিশ্রুতি পূরণের পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। কবি সাখিনাকে বলছেন, সে যেন তার চাচার প্রতি অভিমান না করে থাকে, তার জন্যে জল আনতে গিয়ে জুলুমকারীরা আব্বসের সারা শরীরে তির নিক্ষেপ করেছে। সেই তির লেগে তার মাটির জলের পাত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সাখিনা আর জল পাবেনা। রাসুল তার সমস্ত জীবন তার অনুসারীদের জন্যে ভেবে গিয়েছেন, তারই কন্যার সন্তানদের সঙ্গে নির্মম আচরণ করে খুব ভালো পরিনাম দিয়েছে তারা। মুসলমান হয়ে মুসলমানের প্রতি ন্যায় করতে পারেনা তারা। আলির নাম উচ্চারণ যে করবে বিবি ফাতিমা তার জন্যে মঙ্গল কামনা করবেন। আব্বাসের মৃত্যুর সময় হুর ও ফারিস্তারা মার্সিয়া পড়েছিল, এখন মুসলমানদের দায়িত্ব আব্বাসের হয়ে বিলাপ গাওয়া– এমনটাই কবি মনে করেন।

শব্দার্থ

জারি- যা কিছু ঘটে চলেছে। আলবিদা- বিদায়। গুলামে জার- দাসের অবস্থা। চ্যান- শান্তি। গুফত্গু- আলাপ, ধীরে, ফিস্ফিসিয়ে বলা । লেহ্যে মে- কথা বলার ধরণ, ঢং, সুর । বারিষ- বর্ষা। আব্রু- পর্দা করা । আজরে রিসালাত- বাণি । সিবতে- কন্যার সন্তান সন্ততি বা নাতি-নাতনি । চিরাগা- প্রদীপ। হুর-ও-মালায়েক- অপ্সরা। এহলে আযা- সকলে।

আল্লাহ আল্লাহ ওহ্ জিগার ওহ্ চাশমে নাম সাজ্জাদ কা

জুল্ম কে চাত্তান দেখে অউর সিতাম ফওলাদ কা

১

নওকে ন্যাজা পে সারে আকদাস পিদার কা দেখনা

বান গেয়ি তারিখ দুনিয়া মে ওহ গাম সাজ্জাদ কা

২

কারবালা সে শাম-ও কুফা শুক্র কে সাজদে কিয়ে

কামিয়াবি চুমতি থি হার কাদাম সাজ্জাদ কা

৩

সাতসো কুরসি পার দেখ কার বিজলি গিরি

সারবা রেহনা পিছে থে এহ্লে হারাম সাজ্জাদ কা

৪

আসমা ওয়ালে ভি দেকনে সারে মাঞ্জার ফার্শ পার

কার সাকা না জোরে বাতিল সার কো খাম সাজ্জাদ কা

৫

সির-এ এজিদে কাহে পোতা জা নিশানে

না ফাহিম সামঝা নেহি যাও কাসাম সাজ্জাদ কা

৬

বারিশে মিম্বার ভি হে অউর বলতা কোরান ভি

মারতাবা সামঝা নেহি এহ্লে সিতাম সাজ্জাদ কা

৭

ওয়াক্ত নে কারবাট বাদালালি আ গায়ে মাকতার জাব

হালকি সি মুসকা দিয়ে রাঞ্জো সাজ্জাদ কা।

৮

শ্যাহ্ কে গাম খারো কে আনসু হে মানব্বর হাশ্‌র তাক

হে খুদা কা শুক্‌র আশিক অউর কারাম সাজ্জাদ কা

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

আল্লাহকে স্মরণ করে সব হারানোর পর হোসেনের একমাত্র জীবিত পুত্র আবেদীন বা সাজ্জাদের মনের অবস্থার কথা কবি বলছেন এই নহা'য়। ক্রুরমতিদের অত্যাচারের পাহাড় নেমে এসেছে আবীদের ওপর। বল্লমে গাঁথা পিতা মস্তক দেখার যন্ত্রণা সেদিন এজিদের সভায় উপস্থিত সকলে দেখেছিল আবীদের চোখে। সফলতার সম্মানের শীর্ষে ছিলো আবীদ, সেই আবীদ জঞ্জীরবদ্ধ হয়ে আছে। রাসুল পরিবারের সঙ্গে এমন আচরনের সাক্ষী আসমানবাসীরাও[৭৪] থেকেছেন। কিন্তু কেউ সাজ্জাদকে তার প্রতি হওয়া অনৈতিক আচরণ থেকে মুক্তি দিতে পারলেননা। যিনি কোরানকে আত্মস্থ করেছেন, তার মুল্য অন্যায়কারীরা বুঝতে পারলেন না। সময় অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াবে, এই বিশ্বাস রেখে সাজ্জাদের মুখে হালকা হাসির রেখা দেখা দিয়েছে। এত দুঃখের মধ্যে একটাই আশ্বাসের বিষয় যে একমাত্র হোসেনের পুত্র সাজ্জাদই বেঁচে আছেন, কিন্তু বিলাপকারীরা সাজ্জাদের সঙ্গে হওয়া অন্যায়কে যেন ভুলে না যান।

শব্দার্থ

চাশমে নাম– অশ্রুসিক্ত চোখ। চাত্তান- বড় পাথরের টুকড়ো। ফওলাদ- বিশুদ্ধ লোহা। আকদাস- পবিত্র। পিদার- পিতা। শাম-এ-কুফা- শাম থেকে কুফা নগরী। মানজার- পরিবেশ। ফার্শ- মেঝে, মাটি। বাতিল- মিথ্যা, প্রতারক। ফাহিম- আগ্রহী, প্রখর জ্ঞানী। মারতাবা- মুল্য, সম্মান। কারবাট- ঘুরে দাঁড়ানো। মানব্বর- শ্রেষ্ঠ

লাশে পাড়ে জাবজা

ইয়ে ক্যা হুয়া হে কারবালা লাশে পাড়ে হে জাব্‌জা

[74] আসমানবাসীরা বলতে এখানে সম্মানীয়া যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, যেমন আলি, বিবি ফাতিমা, স্বয়ং রাসুল, পূর্বের নবিগণ, ফারিস্তা সকলে কারবালার প্রত্যেকটি ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন।

১

সিমটি হুয়ি কুছ বিবিয়া সারকো ঝুকায়ে এক জাগাহ্

ইসমে সে হে এক পাসওয়া ওহ্ ভি খাড়ি হে

২

ইয়ে জয়নব-এ দিলগির হে জেহরা কি ইয়ে তাসভির হে

কোরান কি তাফসির হে ইসলাম কি তাকদির হে

হে দুখতারে শের-এ-খুদা

৩

ইয়ে চার সালা লাডলি নাজো আতা কি হে পালি

বাদে খ্বিজা অ্যায়সি চালি মুর্ঝা গেয়ি হে ইয়ে কলি

হে ইয়ে সাকিনা বিন তেশা

৪

শাম-এ-গারিবা নে শুনা জিস দাম ওহ্ সাবকা মার্ঝা

সির পিঠ কার রোনে লাগা আশিক পাড়কার মার্সিয়া

রো রো কে ইয়ে কেহেঙ্গে।

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

যুদ্ধে স্বজন হারানোর পর হোসেন পরিবারবর্গের এক একজনের যে অবস্থা, তার চিত্র কবি তুলে ধরেছেন। ভয়ে, শোকে মাথা নিচু করে এক যায়গায় শহীদগণের পত্নীরা বসে কাঁদছেন। এর মধ্যে একজন এদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এই দুখিনী হলেন বিবি জয়নব যার মধ্যে বিবি ফাতিমা ছবি বর্তমান। যারা বিবি ফাতিমাকে দেখেন নি, তারা যেন জয়নবের মধ্যে ফাতিমাকে খোঁজেন। কোরান তার অন্তরে গাঁথা, এখন জয়নবের হাতে ইসলামের নিয়তির ডোর বাঁধা, এই নারী হলেন আল্লাহ প্রিয় আলির কন্যা। চার বছরের ফুলের মত নিষ্পাপ

হোসেনে আদুরে কন্যা সাখিনা, সে সমস্ত ঘটনা দেখে শোকে মুহ্যমান হয়ে আছে। ১০ আশুরার ঘটনা যে শুনবে সেই-ই শোকে কাতর হয়ে উঠবে, আর মার্সিয়া পড়ে মাথা ঠুকে বিলাপ করবে।

শব্দার্থ

জাবজা- এদিক ওদিক, চারপাশে। পাসওয়া- কাছে এসে। তাকদির- নিয়তি, ভাগ্য। চারসালা- চার বছরের। নাজো সে- যত্ন নিয়ে। বাদে- বসন্ত। খ্বিজা- সময়, ঋতু। মুর্ঝা- নেতিয়ে পড়া। শাম-এ গারিবা- মহরমের ১০ তারিখ, আশুরার দিন। দিলগির- দুখী।

মেরে লাল আকবর

বাবা সে যো কিয়া হে তুনে সাওয়াল আকবর

উসকা জাওয়াব শুনলো অ্যায় মেরে লাল আকবর

১

মেরে জিগার কে টুকড়ে খ্যায়মু মে লউট যাও

জয়নাব সে লো ইজাজাত ফির মেরে পাস আও

পালা হে উসনে তুমকো আখা রা সাল আকবর

২

খ্যায়মু মে সির ঝুকায়েগি বেইঠি হে তেরি মাদার

কারতি হে ওহ্ দুয়া-এ আঁখো মে আশ্ক ভার কার

হো কামিয়াব মেরা ইয়া-জুল-জালাল আকবর

৩

কুলসুম উম্মে ফারওয়া হে মুন্তাজার তুমহারে

আসগার কে মা-সে মিলনা ওহ্ ভি হে মা তুমহারে

উনসে ভি লো দুয়া-এ-মাহে জামাল আকবর

৪

কুরবা বানি হে বেওয়া মুশকিল হে উসকা জিনা

জানে কে বাদ তেরে মার জায়েগি সাকিনা

দোনো বেহেন তুমহারে হে খাসতা হাল আকবর

৫

সাজ্জাদ না তাওয়া কে জাকার কারিব বেয়ঠো

দেকার উনহে দিলাসা ফির মেরে পাস আও

মাজবুর নাতাওকে রাখনা খেয়াল আকবর

৬

তাসভিরে মুস্তোফা [৭৫]হো তাক্বদিরে আম্বিয়া হো

ইসলাম কা সাহারা অউর দি(ন) কা আসরা হো

খ্যায়বার শিকান কি তারহা হো বে মিশাল

৭

বাবা মে তেরে কুরবান ফুপ্পি নে দি ইজ্জাজাত

মে সাবসে মিলকে আয়া অ্যায় শাম্মা-এ-ইমামাত

বোলে হুসেন যাও ইয়ে নেহাল আকবর

৮

মাক্বতাল মে জেয়সে পহ্চা শাহে খুদা কা দিলবার

বারসা-এ-তির আদা হাম শাক্লে মুস্তোফা পার

ইউসুফ ভি সার ঝুকা দি দেখা জো হাল-এ-আকবার

৯

সিনেপে খাক-এ-বারচি আওয়াজ দি পিদার কো

দেখা হুসেন আশিক জিস হাল মে পিসার কো

হে তেরে বাদ মেরে জিনা মোহাল আকবর

[75] আলি আকবরের চেহারার আদল রাসুলের সঙ্গে মেলে সেই অর্থ বোঝাতে তাসভিরে মোস্তফা বলা হয়েছে।

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

আকবর যুদ্ধে ক্ষেত্রে যাওয়ার পূর্বে পিতা হোসেন তাকে বলেছেন, সে যেন জয়নবের অনুমতি। জয়নবের অনুমতি পেলেই তবে তিনি আকবরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রেরণ করবেন। আঠেরো বর্ষীয় আকবরকে পিসি জয়নবই এ অবধি তাকে প্রতিপালন করেছেন। তাবুর মধ্যে আকবরের মা ল্যায়লা মাথা নিচু করে বসে আছেন, সে তার পুত্রের মঙ্গল কামনায় প্রার্থণা করে চলেছেন। কুলসুম, ফারওয়া সকলেই সে চলে যাওয়ার তার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকবে। আসগারেরর মা রুবাব তাকে মায়ের মত স্নেহ করেন, তাই হোসেন বলছেন যুদ্ধ করতে যাওয়ার আগে সে যেন অবশ্যই রুবাবের থেকে যেন বিদায় নিয়ে আসে। আকবরের মৃত্যু হলে তার বেঁচে থাকা মুশকিল হয়ে যাবে। দুই বোন সগরা ও সাখিনার জীবন আকবর ছাড়া শোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। হোসেন তার পুত্রকে মনে করিয়ে দিয়েছেন সে যেন অবশ্যই ভাই সাজ্জাদের সঙ্গে দেখা করে আসে, তাকে সমস্ত সম্পর্কের মূল্য দিতে হবে। এরপর জয়নবের থেকে অনুমতি পেলে আকবর তার পিতাকে জানায় যে সে সকলের থেকে বিদায় নিয়ে এসেছে, এবার তার মূল উদ্দেশ্য পূরণের সময় হয়ে এসেছে। যুদ্ধক্ষত্রে সে যেই পৌঁছালো তার উপর তিরের বর্ষণ হল। তার বুকে তির এসে লাগলে সে তার পিতাকে আওয়াজ দিতে থাকে। হুসেন তার প্রাণ প্রিয় পুত্রকে হারানোর পর বলেছে আকবরের মৃত্যুতে সকলের বেঁচে থাকা খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে।

শব্দার্থ

ইয়া-জুল-জালাল- দয়ালু, মহান। ফারওয়া- কাসিমের মাতা, ইমাম হাসানের স্ত্রী। জামাল- সৌন্দর্য। বেওয়া- বিধবা। খাস্তা হাল- খারাপ অবস্থা। নাতা- সম্পর্ক। আম্বিয়া- সকল রাসুল বা নবিগণকে একত্রে আম্বিয়া বলা হয়, বেমিসাল- অতুলনীয়, শিকান- আঘাত, যুদ্ধ। শাম্মা-এ-ইমামাত- কারো নেতৃত্বে থেকে যে জ্ঞানের আলো অন্তরে প্রবেশ করে। নেহাল-যুবক। পিদার- বাবা, পিতা। পিসার-পুত্র। মোহাল-স্নেহের পাত্র।

নাদা আলি আসগার

নাদা আলি আসগার নাদা আলি আসগার

তানহায়ি মে হোনা না পারেশান আলি আসগার

১

ঝুলে কো ছোড়ে হো তো আ তুঝকো মে সাওয়ারু

শিশ্মাহা মুজাহিদ তেরে সাতকে ভি উতারু

হো দিল আপনা সামহালেগি তেরে মা আলি আসগার

২

হালমিন কি সাদা শুনতে হি আয়ে নারসে শাব্বির

কেহতে হে লাব্বায়িক গিরে ফার্শ পার বেসির

হো রুহে আলি আয়াতে কোরান আলি আসগার

৩

তাকতে হে তেরি রাহ্ আলি অউর পায়াম্বার

ইসলাম বাচানা হে তুমহে খুন মে নাহাকার

হোনা হে তুঝে দিন পে কুরবান আলি আসগার

৪

মিল জায়েগা আম্মু তেরা আব্বাস ওয়হি পার

কাসিম ভি মিলেগা ওয়হি মিল জায়েগা আকবর

হোনে নেহিদেঙ্গে তুঝে নালা আলি আসগার

৫

দোবারা জিবাহ্ কার দিয়ে যাওগে মেরি জাঁ

ফারিয়াদ না কারনা পিস্‌রে শাহ্‌কে শাহিদা

বাবা হে তেরে ফাকরে সোলেমা আলি আসগার

৬

আঠঠারা বারাস কে তেরে ভাইয়া কে ওহ্ চোট

বাতিল কে লিয়ে মওত বানা থা কায়ামাত

আযান-এ আলি আকবারে জ্বিশা আলি আসগার

৭

তুঝকো না মিলা দুধ না এক বুন্দে ভি পানি

রোয়েগা তেরি ইয়াদ মে দারিয়া কি রাওয়ানি

জাঁ তুমপে হে হে কুরবান আলি আসগার

৮

নোহা পাড়তে জাব তেরে নাজির গাম-এ তাড়াপ কার

মাতাম কারে হার এহলে আজা আশ্‌ক বাহাকার

হে আশিক না-চিজ কে আরমান আলি আসগার

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

কবি শিশু আলি আসগারকে বলছেন সে যেন পরপারে গিয়ে যেন সে একাকী না মনে করে। তার রুবাব পুত্র হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে বলছেন যে ছয়মাসের পুত্রও শহীদী মর্যাদা পেল। এখন মা রুবাব কি ভাবে নিজের মনকে শান্ত্বনা দেবে। রক্তে স্নাত হয়েও আসগারকে ইসলামকে বাঁচাতে হবে। মৃত্যুর পর আসগার সকল আপনজনের সাক্ষাত পাবে। চাচা আব্বাস, ভাই আকবর, কাসিম সকলেই ওপারের তার জন্যে অপেক্ষা করছে। আযানের জাদুকর আকবর আঠেরো বছর বয়সে ষড়যন্ত্রের শিকারে পড়ে তাকেও চলে যেতে হল। আসগার মৃত্যুকালীন সময়ে না মায়ের দুধ পেয়েছে, না পেয়েছে এক ফোঁটা জল। যে নদীর পাশে তাকে হত্যা করে হয়েছে, সেই নদীর প্রতিটি ঢেউ আসগারের মৃত্যুর সাক্ষী দিয়ে চলেছে। নহাখান (যিনি নহা পাঠ করে শোনাচ্ছেন) নাজির যখন আসগারের দুঃখে নহা পড়ছেন তখন কবি আশিক সকলকে আসগারকে মনে করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন।

শব্দার্থ

তানহায়ি- নির্জনে, একাকিত্বে। শিশ্মাহা- ছয় মাসের। লাব্বায়িক- 'আমি উপস্থিত আছি' আল্লাহর সেবা প্রদানে সকল লাব্বায়িক ধ্বনি উত্থানকারীরা উপস্থিত। হজ্ব করতে যাওয়া কালে এই ধ্বনি তুলে তীর্থযাত্রীরা তীর্থে যাত্রা করেন। হালমিন-তুমি ব্যতীত আর কেউ নয়। জিশা- প্রশংসিত। রাওয়ানি- ঢেউ, তরঙ্গ। ফাখরে- যাকে নিয়ে গৌরব করা যায়।

আব্বাস তু কুজায়ি

১

সাব্বির থাক চুকে হে লাশে উঠা উঠা কার

কাড়িয়াল জাবান কো লাশা কিস তারহা লায়ে সারবার

মারচারায়ে নাদারাম আব্বাস তু কুযায়ি

২

তেরে জিগার দিয়া হে বাগ্বে শাহে জামান কো

মে দেখতি রেহি হু হার লাশে বেকাফান কো

আজ চাশমে পুরুস আবাম আব্বাস তু কুযায়ি

৩

ইবন-এ-আলি কো প্যায়াসা জিভাহ্ কিয়া গেয়ে হে

তান ছোড় দি জামিন পার সির সিম্‌র লাগায়া হে

জিন ফিকরে দিল কাবাবাম আব্বাস তু কুযায়ি

৪

খ্যায়মে কি দারপে বেইঠি হে মুন্তাজার সাকিনা

রো রো কে কেহ রেহি হে খাস্তা জিগার সাকিনা

মান আব নামি খা-হুম আব্বাস তু কুযায়ি

৫

ওয়াদে হুসেন গ্বাজি কেয়সে কাহু ইয়ে মানজার

নারগ্বে মে শামিয়ো কে বেয়ঠি হু খুলে সির

বে মাক্বনো বে নাক্বাবাম আব্বাস তু কুযায়ি

৬

রানজো আলাম মে ডুবি হে দাস্তান-এ জয়নব

আশিক কে সাথ আসলাম হে নহা খান-এ জয়নব

বা গিরিয়া বা মাতাম আব্বাস তু কুযায়ি

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

হোসেন মৃত দেহ তুলে তুলে হাঁপিয়ে গেছেন, আপনজনেদের বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় তার শরীরের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে আসছে। নিজের মৃত যুবক পুত্রকে তার পক্ষে ফিরেয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছেনা। এই সময় হোসেন তার ভাই আব্বাসকে খুঁজছেন। প্রতিবার নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আব্বাস হোসেনের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থেকেছেন, কিন্তু কারবালার মাঠে সব মৃতদেহ কাফনহীন[৭৬] ভাবে পড়ে আছে। এই দুঃসময়ে তিনি আব্বাসকে ডেকে পাচ্ছেননা। হোসেন কেও জল পান করতে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, দেহ ধুলায় পড়ে আছে, কিন্তু তার পবিত্র দেহ থেকে মুণ্ডচ্ছেদ করে বল্লমে গেঁথে সিমর্ এজিদের দরবারের দিকে রওনা হয়েছে। এমন ঘোর বিপদেও আব্বাস ফিরে আসছেন না। তাবুতে সাখিনা সকলের ঘরে ফেরার অপেক্ষা করছে, চোখের জল তার বুকে উথাল-পাথাল হচ্ছে। আব্বাসের সবচেয়ে স্নেহের সাখিনার দুঃখেও সে ফিরে আসছেন না। তাবুর মধ্যেকার পরিস্থিতিকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দুঃখের সাগরে ডুবে আছেন বিবি জয়নব, কবি আশিকের সঙ্গে নহাখান আসলাম নহা পড়ে আব্বাসকে ফিরে আশার জন্যে অনুরোধ করেছেন।

শব্দার্থ

[76] মৃত্যুর পর যে কাপড় দ্বারা মৃতদেহকে জড়িয়ে কবর দেওয়া হয়। সেই কপড়কে কাফন বলা হয়।

থাক চুকা- হঁপিয়ে পড়া। কাড়িয়াল- যুবক পুত্র। তু কুজায়ি- তুই কোথায় গেলি, আহ্বান করা।বাগ্বে- নৈরাজ্যবাদী। জামান- যে সুন্দর। চাশমে- চোখের দ্বারা। আবাম- আমার বাবা, সিমর্- হোসেনের প্রাণ হন্তাকারী। বে মাকনো-বিনা চাদরে। বে নাকাবাম- নাকাবহীন। বা গিরিয়া-কান্নার সঙ্গে। বা মাতাম- বিলাপ সহকারে। রাঞ্জো- হতাশায় ভরা।

১৪

হাসান কে লাডলে কাসিম

অ্যায় হাসান কে লাডলে কাসিম কাহা হো তুম

মুঝে আওয়াজ দো কাসিম জাহা হো তুম

১

রেহি তাকাত নে ইয়ে কাসিম তেরে আম্মু কো

সুকু(ন) কিউ কার মিলে কাসিম তেরে রাজোর আম্মু কো

সাহারা চাহিয়ে কাসিম তেরে মজবুর আম্মু কো

২

তুমহে মাদার কে লিয়ে কাসিম জেইফি কা সাহার হে

দারে খ্যায়মা সে তুঝকো তেরি আম্মা নে পুকারা হে

হে নারগে মে লায়িনো কে মেরে আঁখো কা তাবহায়ি

৩

তুমহারে সাথ গ্বাজি কো আগার মে ভেজতা রণ মে

তুঝকো ওহ্ লেকে আ যাতে তুমহারি মা কি আঙ্গানমে

ইজাজাত দেকে মে তুঝকো হাসাদু মে ভি উলঝানো মে

৪

লাগাকার হাথ মে মেহেন্দি চালে ওহ্ জয়নব

পালাটকার জলদি আ যাও ইহা খ্যায়মু মে হে হালচাল

তুমহারি ইয়াদ মে কুবরা তাড়াপকার কেহতি হে পালপাল

৫

তেরে পামাল লাশে কো আগার দেখে ওহ্ বেচারি

বাড়ি মুসকিল হে কে পায়ে তেরে গাম মে ওহ্ দুখীয়ারি

মেরে কাসিম দিখাদি তুনে গাজ্বি কি ওয়াফাদারি

৬

হুয়ে দুনিয়াসে রুখসাত কাসিমে তাষ্ণা দাহান আশিক

কালাম কো চুমকার রাখদো বাসাদ আহো ফোগা আশিক

ওহ্ দেখো আকে পোহচে হে মানব্বর নহা খাঁ আশিক।

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এই নহাতে কবি হাসান পুত্র কাসিমকে তাবুতে ফেরার জন্যে আহ্বান করেছেন। হোসেন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসান পুত্র কাসিমকে হারিয়ে বিলাপের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করছেন। কাসিম তার বৃদ্ধ মা ফারোয়ার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। তার মা তাবুর দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে ফিরে আসার জন্যে আহ্বান করছেন। হোসেন বলছেন তিনি কাসিমকে যদি একা না পাঠিয়ে গাজি আব্বাসের সঙ্গে তাকে রণে পাঠালে সে নিশ্চিতভাবে ফারোয়ার কাছে তার সন্তানকে ফিরেয়ে দিতেন। সদ্যবিবাহিতা কুবরার হাত থেকে মেহেন্দির রঙ এখনো বিলীন হয়নি, এর মধ্যে সে বিধবা হয়েছে। স্বামীর কথা মনে করে সে বার বার চমকে উঠছে। যদি ঘোড়ার দ্বারা পদদলিত হওয়া কাসিমের মৃতদেহটি, তার স্ত্রী কুবরা দেখে তবে সে কি ভাবে সহ্য করবে সেই যন্ত্রণা। পিপাসার্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা কাসিমের প্রতি কবি আশিকের শত শত প্রণাম জানিয়েছেন।

শব্দার্থ

রাজোর- দুঃখে কাতর। আম্মু- চাচা, পিতার ভ্রাতা। জেইফি- বুড়াপা, বৃদ্ধ বয়স। লায়িনো- জুলুমকারী। গাজি- সিংহের ন্যায় দৃঢ়চেতা। আঙ্গনেমে- অঙ্গনে। উলঝান- দ্বিধায় পড়া। কুবরা- হাসান পুত্র কাসিমের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী। পামাল- পদদলিত করা। বাসাদ- শত শত। ফোগা- বিলাপকারী।

জাবতাক রেহে হায়াত

জাবতাক রেহে হায়াত হায়ে গাম ভুলায়েঙ্গে

জেহরা তুমহারে লাল পে আনসু বাহায়েঙ্গে

১

হো দোওর পুরা আশোবরা বাতিল কি আন্ধিয়া

হারগিস ভুলানা পায়েঙ্গে কারবাল কি দাস-এ-তা

ফার্শে আযা বিছা-কে জাহান কো বাতায়েঙ্গে

২

দুনিয়া সামঝা সাকিনা শাহাদাত হুসেন কি

দিনে নবি সে পুছিয়ে আজমাত হুসেন কি

এহলে আজা ইয়ে ওয়াকায়া সাব কো শুনায়েঙ্গে

৩

আজান অউর নামাজ হে সিপতে রাসুল সে

ইসলাম কো বুকা মিলি রুহে বাতুল সে

জাবতাক চালেগি সান্‌স ইয়েহি কেহতে জায়েঙ্গে

৪

রাহে খুদা মে জিসনে বাহাত্তর কে সির দিয়ে

কিউ কার পাড়েহ না এয়সি আজা ইনকে মার্সিয়া

হাম হে হুসেন ওয়ালে জাহান কো বাতায়েঙ্গে।

৫

আলে নবি কো ছোড় কার কুরআ(ন) জো লে লিয়া

কুরআ(ন) সে এহলে বেয়ধ্ কো জিসনে কিয়া জুদা

দোজখ কে মুস্তা এক হে ওয়হ জান্নাত না পায়েঙ্গে

৬

বাচ্চে সাওয়াল কারতে হে ইয়ে আপনে বাপ সে

বাড়ে নামাজ দেখিয়ে কেহতে হে আপসে

মসজিদ সে হাম নিকাল কে আযাখানে জায়েঙ্গে

৭

জিকরে হুসেন জো ভি শুনে ওহ্ খুশ নাসিব হে

জো ভি কেহে ইয়ে শির্খ হে ওহ্ বাদ নাসিব হে

মেহশার মে ওহ্ রাসুল কো ক্যা মুহ্ দিখায়েঙ্গে

৮

আশিক ইমামে ওয়াক্ত কা কারতে হে ইন্তেজার

হোগা জাহুর আপকা জাব লেকে জুলফিকার

আনোয়ার জাহাঁ(ন) খওফ কে হাসতি মিটায়েঙ্গে

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

কবি সমস্ত মুসলিমদের মুখপাত্র হয়ে বলছেন যে তারা যতদিন বেঁচে থাকবেন, তারা ফাতিমার সন্তানদের জন্যে চোখের জল ফেলবেন। যতই সেই অন্ধকার সময় কেটে যাক না কেন, কারবালার ঘটনা তারা খনো ভুলতে পারবেনা। পৃথিবীতে বিলাপগান গেয়ে তারা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবে কারবালার ত্যাগের কাহিনি। দুনিয়া ঠিক বুখতে পেরেছি হোসেন কন্যার মৃত্যু কারণ, নবি স্বয়ং হোসেনের গুনকীর্তন করেছেন, তার সম্মানের মূল্য বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। ‘এহলে আযা’রা (সকল বিলাপকারী) সকলকে তাদের মোরতবার কথা জানানোর দায়িত্ব

নিয়েছেন শোকগাঁথা গুলির মাধ্যমে। আজান, নামাজের পৃষ্ঠপোষক হলেন রাসুলের পরিবার, তাদের মৃত্যুর জন্যে আল্লাহ প্রেরিত ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় যে বাহাত্তর জন তাদের প্রাণ দিয়েছেন, তাদের কথা কবিরা কোনোদিনও ভুলবেন না। যারা নবির পথ ছেড়ে শয়তানের রাস্তা অবলম্বন করেছেন তারা কোনোদিন স্বর্গের ঘ্রানটুকুও পাবেনা। কবি বলছেন তারা তাদের নব প্রজন্মকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছেন তারা নামাজের কদর করে আবার মাতমখানায় গিয়ে বিলাপেও মনোনিবেশ করে। যারা হোসেনের গুণকীর্তন শোনেন তারা অনেক সৌভাগ্যশালী, যারা তাদের বিলাপ করা শির্খ বলে গন্য করেন তবে তাদের মত বদনসিব আর কেউ নেই। মৃত্যুর পর তাদের যখন রাসুলের মুখোমুখী হতে হবে তখন তারা কিভাবে তাকে মুখ দেখাবে।

শব্দার্থ

দোওর- সময়। বাতিল- মিথ্যা, প্রতারণা। দাস-তা- কাহিনি। আযা- বিলাপ করা। আজমাত- প্রতিষ্ঠিত, সম্মানীয়। ওয়াকায়া- দুর্ঘটনা। সিবতে- নাতি। বুকা- কান্না। বাতুল-সহ সঙ্গী। মুস্তায়েক- অভিলাষী। শির্খ- আল্লাহর অংশীদারীত্ব করা, ইসলামে এটি সবচেয়ে বড় অক্ষমনীয় অপরাধ। জাহুর- উত্থান, জয়, আবির্ভাব। জুলফিকার- হজরত আলির তরোয়ালের নাম। হাসতি-নৌকা।

ফালাক সে শিগাফ

ফালাক শিগাফ ওহ্ হালো কি ইয়াদ আতি হে

হামে ওহ্ নাজরো কে পালো কি ইয়াদ আতি হে

১

আঠঠারা সাল সে আকবর কো কিস তারহা পালে

গারিব মা কি ওহ্ বারশো কি ইয়াদ আতি হে

২

জামিনে গার্ম পে মাজরু হে নুর কে টুকড়ে

লাহুশে তার ওহ্ উজালো ল ইয়াদ আতি হে

৩

বানি জো রাত কো দুলহান সুবহা হুয়ি বেওয়া

উসি দুলহান কে খায়ালো কি ইয়াদ আতি হে

৪

জামিনে গার্‌ম পে রুক রুক কে চাল নে ওয়ালো কি

ওহ্‌ পায়ে নাজো কো চালো কি ইয়াদ আতি হে

৫

তামামে দাস্তান গাম হি ভুলা দিয়ে আশিক

শহীদ হাক্ক কে রিসালো কি ইয়াদ আতি হে

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

আকাশ থেকে জমিন অবধি কারবালার ঘটনার বিস্তার। কারবালার স্মৃতি কবির চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পান। দারিদ্রতার মধ্যে থেকে কিভাবে জয়নব আলি আকবরকে তিলতিল করে গড়ে তুলেছে তাকে কিভাবে ইসলাম রক্ষা করা জন্যে নিবেদন করেছিলেন সে ঘটনা কারো অজানা নেই। মরুর রেতে পড়ে থাকা শহীদদের ছিন্ন ভিন্ন দেহ গুলির কথা কেউ ভুলবেন না। সদ্যবিবাহিতা নারীর বিধবা হয়ে যাওয়ার দুঃখকে কবি কখনোই ভুলবেন না। শহীদদের হোসেন প্রেমের গভীরতা কবি চিরকাল মনে রাখবেন নহা-মার্সিয়া পড়ার মধ্যে দিয়ে।

শব্দার্থ

শিগাফ- ভাঙন। মাজরু- আহত হওয়া। তামামে দাস্তান- সাধারণ ঘটনা।

থারথারাতা হে আলাম

দাশতে আকবর মে হে ফির ভি থারথারাতা হে আলাম

লেগেয়া থা কোন বাপাস কোন লাতা হে আলাম

১

বলি জয়নব সে সাকিনা ফুপ্পি ইয়ে ক্যায় হুয়া

পানি লেনেকো গেয়ে থে নেহ্র সে আম্মু মেরা

খুন মে ডুবা হুয়া দারিয়ে সে আতা হে আলাম

২

খালি কুজে লেকে বাচ্চে বেয়ঠে হে সাব আস মে

জিক্রে আব্বাস-এ জারি হে ইনকে হার এক সান্স মে

মুন তাজার পানি কে বাচ্চে বেয়ঠে হে বা চাশমে নাম

৩

আপনে হাথোসে কামার থামে হুয়ে বাবা মেরা

কাত্লে গাহ্শে আ রেহে হে শাহে খুদা

সুয়ে খ্যায়মা বাড়তে বাড়তে রোক লেতা হে কাদাম

৪

পুছকার খ্যায়মো সে বোলে শাহা নে হামসির কো

ওয়া কায়াতে শের-এ- হায়দার জয়নব-এ-দিলগির কো

গির গেয়ে হে লাশকারে আদা মে সাকায়ে কারাম

৫

ফির বারসানে লাগে আব্বাস পার ফৌজে শাকি

জাজবাতে ত্যাগো সেনা সে হো গেয়ে ঘায়েল জালি

আরজু-এ-মারতুযা কে হো গায়ে শান-এ কালাম

৬

পৌহচ কার মাক্বতাল মে দেখা হাল-এ গ্বাজি ক্যায় হুয়া

সার সে বেহতা লাহু অউর আঁখসে ঝারি হে খু(ন)

মে তাড়াপ কার রেহ্ গেয়া জাব রুকা গাযি কাদাম

৭

বাড়ে আব্বাসে জারি আশিক হুয়া ইয়ে মাজরা

লুট গেয়ে এক দো পেহের মে ঘারকা ঘার শাব্বির কা

ওকায়াতে কারবালা সাব কো বাতাতা হে আলাম

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

সাখিনা তার ফুপ্পি(পিসি) জয়নবকে প্রশ্ন করছে, তার চাচা জল নিতে নদীর পথে গিয়েছিল, কিন্তু আব্বাসের রক্তে রাঙা হওয়া নদীর কিনারা থেকে তিনি যে নিশান নিয়ে গিয়েছেন তা ফিরে এসেছে। খালি জলের পাত্র নিয়ে জল ভেজা চোখে শিশুরা জলের আশায় বসে আছে, আর গাজি আব্বাসকে স্মরণ করছে। মৃত আব্বাসকে যখন কাতলগাহ্ (কারবালা) থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন, তখন মনে ব্যথায় জর্জরিত হোসেনের পা আর চলছে না। আব্বাস কারবালার মাঠে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে তার উপর তিরের বর্ষা হল তারপর শরীর থেকে দুই হাত কেটে আলাদা করে দেওয়া হয়। হোসেন যখন আব্বাসের খোঁজে গেলেন তখন মাথা ও চোখ থেকে তার রক্ত ঝরছে। এই দৃশ্যের কথা মনে করে কবির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

শব্দার্থ

আস মে- আশায় আশায়। চাশমে নাম- অশ্রুসিক্ত চোখ। দিলগির- শোকাতুরা। সাকায়ে- যে পিপাসার্তকে জলের ব্যবস্থা করে দেন।

কাহা মাজলুম সাকিনা

জয়নব সে লিপাট কার কাহা মজলুম সাকিনা

বাবা কো বুলাও মেরে আম্মু কো বুলাও

১

কানো সে লাহু বেহ্তা হে দুখতা হে গালা ভি

কিস তারহা মে সোউ সিনা ভি হে জাখ্‌মি

জ্বালতা হে হার এক জাখ্‌ম জাব লাগতা হে পাসিনা

২

হার এক সিম্‌ত সে আতি হে ইয়ে কাঁটে ইয়ে ফিযা মে

সাব ছোর গেয়ে হামকো জো গারদা বেবালা মে

কেহতা হে হার এক শাক্‌স ডুবেগা সাফিনা

৩

ইস দেশ মে আপনা কই-ই হামরাজ নেহি হে

লাচার হু মে তাক্বতে পুরবাজ নেহি হে

নালো কে সিবা পাস মেরে কুছ ভি তো রেহি না

৪

কারবাল মে ওহ্‌ মানজার জো বাসি মেরে নাজার মে

বাকি রেহি না তাব ইয়ে সাদ্ব চাক জিগার মে

হে গান্‌জ(কারবাল) -এ শাহিদা মে জো জেহ্‌রা কা খাজিনা

৫

মিলনে সে নেহি আতে হে কিউ আকবর কাসিম

ক্যায়সে গায়ে কারবাল মে ওহ্‌ ফৌজ বানি হাসিম

হাম সে না ওয়াফা কিজিয়ে মহরম কা মাহিনা

৬

আশিক ইয়ে কাহা কাজরাতে জয়নব সে ওহ্‌ দুখিয়া

মেরে লিয়ে আয়ি হে ইয়ে পেয়গাম ক্বাজা কা

মে জা নেহি সাক্তি হু জিন্দা সে মাদিনা

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

সাখিনা তার জয়নবকে জড়িয়ে ধরে তার বাবা হোসেন এবং চাচা আব্বাসের খোঁজ করছে, কান থেকে রক্ত ঝরছে, কেঁদে কেঁদে বুকেও তার ব্যথা হয়েছে, তার ওপর হওয়া প্রতিটি প্রহারের ফলে তৈরি ক্ষতের ওপর অসহ্য পীড়া অনুভব করছে সে। চারিদিকে যেন তার জন্যে কাঁটা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। সব আপনজন তাকে ছেড়ে চলে গেছে সেই কারবালার ময়দানে। পরদেশে তার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী নেই, দুঃখ ছাড়া তার জীবনে আর কোনও কিছু অবশিষ্ট নেই। কারবালার অসহ্য মৃত্যুর দৃশ্য গুলো তার চোখের সামনে ছবির মত ভেসে উঠছে। হৃদয়ের প্রতিটি কোনায় তার সেই দুঃখে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। ভাই আকবর কাসিম কেউ শত্রুদের হাত থেকে জীবিত ফিরে আসেনি, মহরম মাস তাদের জন্যে ধ্বংসবার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। চিন্তা ও দুঃখে জয়নবের কালি ধরা চোখ তাদের সঙ্গে ঘটা জুলুমের স্পষ্ট সাক্ষী দিচ্ছে। সাখিনা পয়গাম দিচ্ছে তার ফুপি জয়নবকে যে তার হয়ত অন্তিম সময় চলে এসেছে, তাই সে জীবিত অবস্থায় তার মাতৃভূমি মদিনায় ফিতে যেতে পারবেনা।

শব্দার্থ

সিমত্- চারদিক। গিরদাব- ঘূর্ণবাতের ন্যায়। বালা- বিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী। খাজিনা- দৌলত, সম্পদ। গুন্‌জ- প্রতিধ্বনিত হওয়া। কাজরাতে- কাজলযুক্ত আঁখি, এখানে কালি পড়া চোখ। লেহরাতে- ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। কোড়ো- চাবুক। পুরসোজে- বিষাদগ্রস্ত। ফিজা- বাতাস। যাফান- কয়েদখানা। পোশাকে সিয়ামে- কালো।

আব্বাসে আলামদারাম

ইয়ে মুন-এ সোগাম খারাম আব্বাসে আলামদারাম

১

খ্যায়মে হুসেনি মে প্যায়সো কি উঠি নালে

শাব্বির ভালা কেয়সি আবদিল কো সামহালে

সাক্কা-এ-মাদাতগারাম আব্বাস আলামদারাম

২

ইস হাশ্‌র কি গারমি মে মিল গেয়ে আগার পানি

মজলুম সাকিনা পার হো জায়ে মেহেরবানি

গ্বাজি-এ-ওয়াফাদারাম আব্বাস আলামদারাম

৩

লেহ্‌রা গেয়ে গ্বাজি ইসলাম কে পাঞ্চমকো

কিস তারাহ্‌ ভুলায়ে হাম শাব্বির কে হামদাম কো

হাম রাজে তারাফ দারাম আব্বাস আলাম দারাম

৪

হায়দার কি তামান্না হো জেহ্‌রা কি দুয়া হো তুম

ইস আলা মে ঘুরবাত মে আব পুশত্‌ পানাহ্‌ হো তুম

গ্বাজি মাদাত গারাম আব্বাস আলাম দারাম

৫

পামাল হুয়া লাশা ফারওয়া কে গুলেতার কো

সিনে পে লাগি বারচি হামশাক্‌লে পায়াব্বার কো

ইয়ে নাসিরো জার্‌রারাম আব্বাসে আলামদারাম

৬

সার নওকে সেনা পার হে শাব্বির-এ বারাদারকা

ইস গাম মে তাড়াপ তা হে ইজাজে দিলাফার কা

মান বেকাসো লাচারাম আব্বাস আলামদারাম

৭

জাব কাত্‌লে হুয়ে গ্বাজি আশিক লাব-এ দারিয়া পাস

জয়নব নে কাহা রো রো কার অ্যায় মেরে বারাদার

কায়ি তাব-এ সুখান দারাম আব্বাসে আলামদারাম।

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

আব্বাসের মৃত দেহ দেখে তাবুর মধ্যে বাঁধ ভাঙা কান্নার রোল উঠল, এই সময় ইমাম হোসান কি ভাবে তার পরিবারের মুখোমুখি হবেন, ভাই আব্বাস গিয়েছিলেন পিপাসার্তদের জলে ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জল আনতে, এই কারণের জন্যে শত্রুদের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হবে তা তিনি কল্পনা করেননি। মাদাতগার বা সাহায্যকারী চলে গেলেন। প্রচন্ড তপ্ত আবহাওয়ায় যদি সাখিনা একটু জল পেতেন তবে তার বড় উপকার হয়। ইসলামের নিশান বাতাসে উড়িয়ে গেলেন নবভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। জলের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তিনি ভেক ধারণ করেন নি, তার প্রকৃত পরিচয় নিয়েই তিনি কারবালায় পদক্ষেপ রেখেছিলেন। ফাতিমার বহু প্রার্থণা ফসল গাজি আব্বাস, পরদেশে এসে সকলের রক্ষাকারী তিনি। নদীর কিনারায় রক্তাক্ত আব্বাসের নিথর দেহটি পড়ে থাকতে দেখে কেঁদে কেঁদে জয়নব বলেছেন, তারা সুরক্ষা কবজের মৃত্যু হয়েছে।

শব্দার্থ

নালে- হঠাৎ পাওয়া শোকে বাঁধ ভাঙা কান্না। সাক্কা-এ-মাদাতগারাম- পিপাসার্তদের সাহায্যকারী। ওয়াফাদারাম- একনিষ্ঠ ভক্ত, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। পঞ্চম- নিশান, পতাকা। ঘুরবাত- জন্মভূমি থেকে অন্য স্থানে এসে থাকা। অত্যন্ত দারিদ্রতার কারণে নিজের গৃহ ফেলে এসে অন্য স্থানে থাকা। ফারওয়া- কাসিমের মা তথা ইমাম হাসানের স্ত্রী। গুলেতার- পুত্র। বারাদার- ভাই। দিলাফার- সাহসী। লাচারাম-অসহায়। পুশত্-পানাহ্- সমর্থনকারী।

আব্বাস আগার হোতা

জয়নব নে কাহা রোকার আব্বাস আগার হোতা

লুটতা না আলি কা ঘর আব্বাস আগার হোতা

১

ভিরান না হোতা জেহ্রা কি চামান ইয়ে রব

হাসতা না খিজা হাম পার আব্বাস আগার হোতা

২

শিশমা হা মুযাহিদ পার ইয়ে জুল্‌ম নেহি হোতা

চালতি না ছুরি দিলপার আব্বাস আগার হোতা

৩

লুটতি না কামায়ি ভি আঠঠারা বারাস কি ইউ

হোতা না জুদা আব্বাস আগার হোতা

৪

শাব্বির কো সাজদে মে কারতা না জিভাহ্‌ যালিম

রোতা না দিল-এ হায়দার আব্বাস আগার হোতা।

৫

রুখসার-এ সাকিনা পার লাগতি না তামাচে ভি

ছিদ জাতি না ইউ গওহার আব্বাস আগার হোতা

৬

ওহ্‌ সুবহায়ে আসুরা তা আস্‌র কি ওহ্‌ পাল পাল

হোতা না বাপা মেহ্‌শার আব্বাস আগার হোতা

৭

জিন্দান মে রো রো কার কারতি থি বায়ান জয়নব

হোতা না সিতাম হামপার আব্বাস আগার হোতা

৮

উট-ও পে হামে আদা দার দার না ফেরাতে ইউ

বে মাকানো বে চাদার আব্বাস আগার হোতা

৯

আশিক না আজ্‌জা হোতা না বাপা মাতাম

উঠা না আলাম ঘর ঘর আব্বাস আগার হোতা

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এই নহাটিতেও সকলের কাছে গাজি আব্বাসের মূল্য কতখানি তা ফুটে উঠেছে। আব্বাস যদি থাকতেন বিবি ফাতিমা ঘর এই ভাবে শূণ্য হয়ে যেতনা। সে থাকলে ছয়মাসের দুধে শিশুর প্রাণ যেতনা। আলি আকবরের বিচ্ছেদ যন্ত্রণাকে তার পরিবারকে সহ্য করতে হতনা। সে থাকলে ইমাম হোসেনের সিজদারত অবস্থায় শিরোচ্ছেদ করা হতনা। সাখিনার গালে জুলুমকারীরা চপেটাঘাত করতে পারতোনা, জয়নব কারাগারে থাকাকালীন সময়ে প্রতি মুহুর্তে ভাই আব্বাসকে মনে করে চলেছেন। সে থাকলে কখনোই এজিদসৈন্য বেপর্দা করে তাদের রাস্তায় নামিয়ে কুফাবাসীর কাছে হাস্যস্পদে পরিণত করার সুযোগ পেতনা।

শব্দার্থ

শিশ্মাহা- ছয় মাস। জিভাহ্- হত্যা করা। রুখসার-এ-সাকিনা- সাকিনার গাল।

নওয়ে কারবালা

কও তেতাল হুসেন ইবহাল হুসেন

নওয়ে কারবালা ইয়া হাবিব আল্লাহ

১

আপ জিস শাব্বির কো দি হে কুরআ(ন) কি কিতাব

কারবালা মে হো গেয়ি হে টুকড়ে টুকড়ে ওহ্ কিতাব

২

ফাতিমা জেহ্রা খাড়ি হে অউর আয়ে জিব্রাইল

লাশ পার রো রো কে ফারমাতে হে ইয়া রাব্বে জালিল

৩

শাহে মারবা শের-এ ইয়াজদা কুওয়াতে পারবার দিগার

কেহ রেহে হে বে ফওগা জিনকো মিলি হে জুলফিকার

৪

আপকে কুছ উম্মাতি জো সাহিবে ইমান থে

লুটা হে কুরআ(ন) কো জো হাফিযে কোরান থে

৫

বাড়ে কাত্‌লে শাহ্‌ হাদি আহমেদ বাগির দুয়ে সাদা

শামিয়া বাস্তান দে বাজু জয়নব ও কুলসুম রা

৬

তাষনা লাব শাব্বির কো আয়ে শাহে আলি মুকাম

বুন্দ পানি না দিয়ে ওহ্‌ মুসালমা নে শাম

৭

রাহে হাক্ব আশিক হুসেন ইবন-এ-আলি সার রাবেদার

দাশ্‌তে দার দাশ্‌তে ইয়াযিদে বেহায়া হারগিস না ডার

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

কবি রাসুলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন তিনি যাকে কোরান হেফাজত করা দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। দায়িত্ব রক্ষাকারী হোসেন ও কোরান এই দুই অমূল্য সম্পদকেই কারবালায় টুকরো টুকরো করা হয়েছে। মৃত্যুর সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মা ফাতিমা ও ফারিস্তা জিব্রাইল। তারা এমন নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের সাক্ষী থেকে আল্লাহের কাছে কেঁদে অভিযোগ করছেন। এই ভাবে একের পর এক হত্যাযজ্ঞ চলেছিল কারবালায়। পরবর্তীতে যার সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হয়েছিল হোসেন পরিবারের জীবিত সদস্য জয়নব ও কুলসুমদের।

সাফার হায়ে সাকিনা

কেয়সে কিয়া হে তুনে সাফার হায় সাকিনা

সাবকো মিলি রেহায়ি মাগার হায় সাকিনা

১

এক সাথ মাদিনে সে ছালি আপনি আমারি

হারহাল মে দিনরাত মেরে সাথ গুজারি

জয়নব কে দিল জার পে চাল নে লাগি আরি

ইস হাল মে যাউ মে ভালা কেয়সে মাদিনা

২

আসুর কে তুফান কো দেখে হো মেরে সাথ

পুরহোল ওহ্ ময়দান কো দেখে হে মেরে সাথ

কারতি থি বুকা সাথ মেরে তো ভি হাজিনা

৩

ভাই-ই তু জুদা হ গেয়ে তো সাথ না ছোড়ি

গ্বাজি ভি জুদা হো গায়ে তো সাথ না ছোড়ি

কাসিম ভি জুদা হো গেয়ে তো সাথ না ছোড়ি

মে তেরি কাসাম তুঝকো ভুলাউঙ্গি কাভি না

৪

জ্বালতে হুয়ে খ্যায়মে সে তুঝে মেয়নে নিকালি

দামান মে লাগি আগ তুঝে মে সামহালি

বিবি তুঝে রো রো কে কালেজে সে লাগায়ি

ভাই কি আমানাত তুঝে মে মওত সে ছিনা

৫

পুছেগি জো সগরা আকবর কো হুয়া ক্যায়

নানহাসা মুজাহিদ আলি আসগার কো হুয়া ক্যায়

আব্বাসে জারি মেরে দিলাবার কো হুয়া ক্যায়

ইস গামসে না ফাট না জায়ে কায়ি মেরে ইয়ে সিনা

৬

জিন্দান সে রেহা হোকে কায়ি জয়নব এ মুজতার

আশিক ইয়ে বায়া কারকে চালি জয়নব-এ মুজতার

আনোয়ার ইয়ে ফওগা কেহ্ কে চালি জয়নব-এ-মুজতার

মে জি নেহি পাওউঙ্গি ইয়ে আলাম মে সাকিনা ।

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

কবি বলছেন এই কাঁটা ভরা পথে সাখিনা কি ভাবে চলেছিল, অশেষ জুলুমের পর সকলে মুক্তি পেলেও সাখিনার আর মুক্তি পাওয়া হলোনা। একদিন তারা সকলে মদিনা থেকে পাড়ি দিয়েছিল কুফার পথে। সব রকম পরিস্থিতেতে তারা সকলে একই সঙ্গে ছিল, মুক্তির পরে জয়নব বলছে সে কিভাবে একা মদিনায় ফিরে যাবে সাখিনাকে ছাড়া, আশুরার দিনের সেই কালো ঝড় হোক কিংবা বন্দিদশার রক্তঝরা দিন সব সময় সাখিনা জয়নবের সঙ্গে থেকে দুজন দুঃখ ভাগ করে নিয়েছেন। ভাই হোসেন ও আব্বাস, কাসিম সকলেই শারিরীক ভাবে ইহদুনিয়া ত্যাগ করলেও জয়নবের অন্তরের জগত থেকে তারা কখনো আলাদা হয়ে যাবেনা। সগরা যখন জয়নবকে আকবর, আসগারের ফিরে না আসা নিয়ে প্রশ্ন করবে তখন সে কি উত্তর দেবে। বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে তাদের মনের অবস্থা কবি আশিক নহা মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে চলেছেন।

শব্দার্থ

ফওগা- কান্না। আমারি- দল বেঁধে চলা।

জয়নব কে বারাদার

হাসান কে ভাই হে ইয়ে জয়নব কে বারাদার

লাগতা হে সুয়ে নেহ্র চালে আতে হায়দার

আব্বাস দিলাবার হে ইয়ে আব্বাস দিলাবার

১

হায়দার কে সুজায়াত সে সাজায়ে গেয়ে আব্বাস

তাসভিরে ইয়ে দুল্লাহা বানায়ে গেয়ে আব্বাস

সারওয়ার ইনহে লায়ে হে আলামদার বানাকার

আব্বাস দিলাবার হে ইয়ে আব্বাস দিলাবার

২

ইয়ে শের-এ গাজাব নাক কা কই নেহি সানি

হে হাল মে দারিয়ে সে উঠায়ে গেয়ে পানি

সাক্কায়ে সাকিনা হে বাফাও কা সামান্দার

আব্বাস দিলাবার হে ইয়ে আব্বাস দিলাবার

৩

পায়ি না রিজা রণ কি শাহে দিন সে গেয়ি

বারনা ইয়ে উলাত দেতি তেরি তাক্‌তো কো কাজি

বেসার নাজার আতে ইয়ে জমি পার তেরা লাশকার

আব্বাস দিলাবার হে ইয়ে আব্বাস দিলাবার

৪

আব্বাস কো হাথো মে ফাখাত মাশ্‌ক ও আলাম হে

উন প্যায়াস কে মারো কো আলামদার কো গাম হে

দাম তোড় দেনা তাষনা দাহান কো গাম হে

আব্বাস দিলাবার হে ইয়ে আব্বাস দিলাবার

৫

যাব মাশ্‌ক কো আব্বাস নে পানি সে ভারি হে

উস ফৌজ যাফা কার কোহ্‌রাম মাচি হে

সেয়রাব নাহো যায়ে কাহি আল-এ পায়াম্ববার

আব্বাস দিলাবার হে ইয়ে আব্বাস দিলাবার

৬

ঘেরা হে আলামদার কো জাব এহলে জাফা নে

শানো পে কিয়া বার জুদা হো গেয়ে শানে

এক তির সিতামগার লাগি মাশ্‌ক পে আকার

আব্বাস দিলাবা হে ইয়ে আব্বাস দিলাবার

৭

আশিক না আলামদারকে কাবু মে আলাম হে

আখরি মানজিলপে ওয়াফাদার কা দাম হে

কই-ই না রাহা শেহ কে মাদাতগার মানব্বর

আব্বাস দিলাবার হে ইয়ে আব্বাস দিলাবার

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

হাসান ও জয়নবের ভাই হলেন গাজি আব্বাস। মনে হয় তিনি জল নিয়ে নদীর থেকে ফিরে আসছেন। হজরত আলির সমস্ত গুণ তার মধ্যে সজ্জিত হয়েছে, আল্লহ তাকে তার পিতার মত করে জ্যোর্তিময় করে সৃষ্টি করেছেন। পিপাসার্ত সাখিনাকে সাহায্য করার জন্যে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যুদ্ধ করার অনুমতি তিনি পাননি, তিনি জল লাভের জন্যেই নদীর পথে চলেছিলেন। যদি এমন তা হত তবে জুলুমকারীরের শিরদাড়া ভাঙার ক্ষমতা তিনি রাখেন। যেই তিনি পাত্রে জল ভরলেন সেই মুহুর্তেই সৈন্যদের মধ্যে শোরগোল বেধে গেল তাকে হত্যা করার জন্যে। আব্বাসের মৃত্যু হলে তাবুবাসী পাছে না তৃষ্ণার্ত না থেকে যান বলে কবি চিন্তা করছেন।

শব্দার্থ

সুয়ে- দিকে। সুজায়াত- বাহাদুরি, নির্ভিকতা। ইয়েদুল্লাহ- আল্লহর সাহায্যের হাত বা দৃষ্টি। সানি- সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। সাক্কায়ে- পিপাসার্ত কে সাহায্য করে। রিজা- অনুমতি। কোহরাম- বহু স্বরে কান্না। সেয়রাব-অতিশয় তৃষ্ণার্ত। ফাখাত- একমাত্র। জাফা- জুলুমকারী।

নারায়ে হেয়দার

নারায়ে হেয়দারি ইয়া আলি ইয়া আলি

১

ইয়ে নাসরে নবুয়াত তো ফাখ্‌রে আম্বিয়া হে

তেরে দি দমসে মওলা ইসলাম কি বাকা হে

বাতিল শিকাশ্‌ত খায়ি জাব ইয়ে সাদা উথি

২

বু-ইয়ে ওয়াফা তুমহারি কোরান মে মিলেগি

তেরে কারাম কি খুসবু আজান মে মিলেগি

দিন-এ খুদা কো বাখশি তুনে হি জিন্দেগি

৩

ইসলাম কেলিয়ে জাব পেয়দা হুয়া হে খাতরা

কারবালা মে পোহচি তেরা লাহু কা কাতরা

তেরে চামাক রেহি থি হার সিম্‌ত জুল্‌ম লি

৪

আকবার সে নওজাবা ক রাহে খুদা নে দেদি

ফারওয়া কি জানে জাঁ কো রাহে খুদা নে দেদি

বেশির কি গালে পার তিরে সিতাম লাগি

৫

লেহরা কে চাল দিয়ে হে পারচাম ওয়াফা ক গ্বাজি

বেখওফ সো গেয়ে হে দারিয়া পে ওহ্ নামাজি

দুনিয়া সামাঝ সাকি না গ্বাজি কি তাঞ্চেগি

৬

বাদে হুসেন আশিক জয়নব হুসেন বানকার

বাতিল কি সির কুচাল দি কিতনে আলি নে আনোয়ার

ফির না সাওয়ালে বেয়াত দুনিয়া মে উঠ সাকি

-আশিক মুর্শিদাবাদি

ভাবার্থ

এই নহাতে হোসেনের পিতা হজরত আলির স্তুতি করা হয়েছে। তার কঠোর পরিশ্রমে ইসলামের পথ নির্মিত হয়েছে। তার সত্যবাদীতার সঙ্গে কোরানের বাণীর তুলনা করা হয়েছে। প্রতি আজানে তার প্রতিদানের সুর ভেসে আসে। ইসলামের জন্যে যখন দিকে দিকে বিপদ তৈরি হল তখন, আলির সন্তানেরাই ইসলাম বাঁচাতে কারবালার মাটিকে রাঙিয়ে তুলেছিল। ফারোয়ার প্রাণ কাসিমকে তিনি খুদার পথে নিবেদন করেছেন। এখনো দেখা যাচ্ছে আব্বাস ইসলামের নিশান নিয়ে জল আনতে চলেছেন। নির্ভয়ে নামাজি ইমাম হোসেন নদীর পাড়ে চিরনিদ্রায় গেলেন। দুনিয়া সেদিন বোঝেনি তাদের চরম পিপাসাকে। সকলকে হত্যা করার পরও আলি বা হোসেনের প্রতি মানুষের আনুগত্যকে কারো পক্ষে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

শব্দার্থ

কুচাল দি-পদদলিত করা। ফাখ্র- গর্ব। আম্বিয়া- সকল নবিগণকে একত্রে আম্বিয়া বলা হয়। বাকা- পথ। বায়েত- আনুগত্যের সপথ। পারচাম- পতকা।

উপসংহার

সালাম ও নহা মধ্যেকার মূল তফাৎ উপস্থাপনা ও সুর প্রয়োগে। সালামে বুক চাপড়ানো থাকেনা, কিন্তু নহা গাওয়ার মূল শর্তই হল বুক চাপড়ানো, এই বুক চাপড়ানোর ছন্দে নহা'র সুর রচিত হয়। তবে যখন

বিলাপকারী বিলাপ করতে বসেন তখন তিনি নহা পাঠ করবেন বলে বসেন না বরং তার সঙ্গে সালাম, কোরানের আয়াত বা লাইন পাঠ করে মানবজাতি হিতের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন। সেই সঙ্গে ইসলামে হোসেনের গুরুত্বকে বারবার মনে করিয়ে দেন। তারপরে নহা পাঠ করেন, নহা পাঠ যে করেন তিনি ও যে শ্রোতা সকলকে বুক চাপড়াতে হয়। বুক চাপড়ানো বিলাপের একটি ভঙ্গিমা, এটি ছাড়া বিলাপ করাকে বিলাপ বলে গণ্য করা হবেনা। আর নহা আকার ছোটো হয়, কারণ একটি বিশেষ ঘটনাকে এখানে দেখানো হয়। তবে মার্সিয়াও শোকের কবিতা কিন্তু আকারে অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে। সেখানে নাট্য কবিতার মত করে কবি চরিত্রদের নিয়ে আসেন। পাঠ করার সময়ে বুক চাপড়ানো থাকেনা।

উপসংহার

নোমাডিয় কুরবাতিরা যাযাবর জীবন ছেড়ে যখন মুর্শিদাবাদে স্থানীয় ভাবে বসতি শুরু করল তাদের সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন নবাবীরা। চলে যাওয়া নবাবী রাজত্বে নবাবের শাসন না থাকলেও, প্রভাব ঠিকই আছে। সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তারা যাযাবরীর কুরবাতিদের আশ্রয় তৈরি করে দিয়েছেন। উদারতার দিকটি প্রকাশ পেলেও তার প্রকৃত কারণ কুরবাতিদের ধর্মীয় বিশ্বাস। কুরবাতিদের হোসেন প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠতার বিচার করেই নবাবীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বলা যেতে পারে ভারতবর্ষে এমন আরও অনেক পিছিয়ে পড়া জনজাতিরা আছে, কুরবাতি ইরানী ছাড়া অন্তরে হোসেন প্রেম ব্যতীত এমন জনজাতিকেও কি তারা এমন ভাবে সাহায্য করতেন এই প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু নবাবীদের উদ্যোগের কারণে যে এক পিছিয়ে পড়া জনজাতির মাথার ওপরে এক নিরাপত্তার আশ্রয় গড়ে উঠেছে, সেই কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায়না। শ্রেনীগত বৈষম্য বর্তমান সমাজে ভীষণভাবে প্রকট, নবাব পরিবারের মধ্যে সেই এলিটিজম্ থাকাটা খুব স্বাভাবিক। মুর্শিদাবাদের নবাবীদের মধ্যে কুরবাতিদের প্রতি সবসময় এক সহানুভূতি কাজ করে, এর থেকেই শ্রেণিগত বিভাজনের দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমার কাজের মধ্যে দুই জনজাতির মধ্যে ব্যাপক তফাৎ থাকা সত্ত্বেও কোন বিষয়টি তাদের একসূত্রে গেঁথে রেখেছে সেই দিকটি আলোচনা করতে গিয়ে শিয়া দর্শনতত্ত্বটি আলোচনা করতে হয়েছে। এই দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মানসিকতা কী ভাবে কাজ করে এবং যার ফল স্বরূপ অন্য জনজাতির সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতিকে ভাগ করে নিচ্ছেন কিভাবে তা দেখানোর একটি প্রয়াস আছে। শিয়াদর্শন ও কারবালার কাহিনি

থেকে যে সাহিত্যধারা উঠে এসেছে, সেখানে কুরবাতি ইরানী ও নবাবীরা দুজনেই অংশগ্রহণ করেন। এক সময় মহরম পালনের সময় নবাবরা মাতম করার উদ্দেশ্যে সুদূর ইরান থেকে খ্যাতনামা মাতমকারীদের নিয়ে আসতেন। বর্তমানে শোকগাথা রচনার ক্ষেত্রে দুই শিয়াপন্থিদের সকলেই সমানভাবে সাহিত্যিক নিদর্শন সৃজনে এগিয়ে এসেছেন। মুর্শিদাবাদে নহা সংস্কৃতির অনেকটাই আওয়াধ থেকে এসেছে। কিন্তু মহরমের সময়ে তারা যে নিয়মে মহরম পালন করেন তার পুরো মিল হায়াদ্রাবাদের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ হায়াদ্রাবাদে ৬ মহরম হাসান পুত্র কাসিম ও কুবরার বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কাসিমের সঙ্গে কুবরার বিবাহের পূর্বেই কাসিম শহীদ হয়ে যান, সেই ঘটনাকে স্মরণে রেখে হায়াদ্রাবাদী মুসিলম সংস্কৃতিতে বিয়ের আয়োজন করে সাজানো হয় কাসিম ও কুবরার বিবাহমণ্ডপ এবং কারবালাকেন্দ্রিক ঘটনাকে নিয়ে নানা অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। মুর্শিদাবাদে সেই ট্রাজিক ইতিহাসকে স্মরণ করে অভিনয় করা না হলেও কাসিমের কাল্পনিক বিবাহ আয়োজন করা হয়। আর ১০ দিন যাবত একেক জনের স্মরণে শোকানুষ্ঠানের আয়োজন হয়, সেখানে হায়াদ্রাবাদের থেকে মুর্শিদাবাদের তফাৎ নেই। বলা যেতে পারে মহরমের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে আওয়াধি ও হায়াদ্রাবাদী দুয়ের-ই প্রভাব রয়েছে। মহরমের সময় নহা রচনা ও তা পাঠ করাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দৃষ্টিতে দেখা হয়। এই কারণে কুরবাতি ইরানীরা যখন এই নহা বা শোকগাথা রচনায় নিজেরদের কৃতিত্ব দেখান তখন তাদের সমাজে আলাদা রকম কদর তৈরি হয়। সাহিত্য রচনা থেকে একজনে মানুষের সামাজিক স্তর পরিবর্তন ঘটে। ইতিহাসের পালাবদল থেকে শুরু করে সামাজিক পালাবদলের মধ্যে দিয়ে কিভাবে মুর্শিদাবাদে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমরা নিজেদের আলাদা আইডেন্টিটি তৈরি করেছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

বাংলায় ইসলামিক ইতিহাসগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এত আবেগের মিশ্রনে রচিত হয়েছে যে ইতিহাসের দায় রক্ষার কথা বারবার লেখক ভুলে যান। আবেগ ও ইতিহাস এক বিষয় নয়, অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় ইতিহাস রচনা করতে বসে লেখকেরা নবি কিংবা ইসলাম প্রেমে এতই ভেসে যান যে তাতে সাহিত্যগুণের প্রবেশ ঘটে যায়, ইতিহাস রচনার স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। আমি আমার কাজে একাধিক স্থানে ইসলামিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং অলৌকিকতাকে বর্জন করে সঠিক তথ্যের দ্বারা পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছি। মীর মোশারফ হোসেনের ‘বিষাদ সিন্ধু’ কারবালার উপর আধারিত কাহিনি। এর মধ্যে ইতিহাসের অনেক উপাদান থাকলেও এটি সাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে লিখিত, ইতিহাসের যথাযথ

পরিবেশন এর লক্ষ্য নয়। ঊনবিংশ শতকের ভারতের জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষিতে এটি লিখিত হয়েছিল এটাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি ইতিহাসের কঙ্কালের উপর নির্মাণ করেছেন কল্পলোকের নান্দনিক স্মৃতি শৌধ। ইতিহাস ও ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ সূত্রে এরিস্টটল বলেছেন, ইতিহাস হল সত্য ঘটনার বিবরণ, আর ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্য ইতিহাসের কঙ্কালের উপর কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য। সেই ক্ষেত্রে 'বিষাদ-সিন্ধু' ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস বিষয়ের সমর্থন পেতে পারি।

আমার আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটির বিষয় নিয়ে পূর্বে কখনো আলোচনা হয়েছেও বলে আমাদের জানা নেই। সেই অর্থে এটিই এই বিষয়ক প্রাথমিক প্রয়াস। এক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন করা আমার জন্যে সহজ ছিলনা। বৃহৎ একটি ক্ষেত্র থেকে ছোটো একটি অংশ বেছে নিয়ে তার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। নহা ছাড়া আরও সাহিত্য সংরূপ মুর্শিদাবাদে গড়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্য রচনা হলেও তা সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এমনকি প্রতি বছর নতুন করে মহরমের সময়ে যখন শোকগাথাগুলি রচনা করা হয় তখন পূর্বে রচিত কবিতাগুলি আর সংরক্ষিত হয়না। সেই কারণে আমার কাজে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শোকগাথার সংগ্রহ যুক্ত করেছি।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে 'নহা' নামক ছোটো ক্ষেত্রটিই বেছে নিতে হয়েছে। এছাড়া বর্তমান নবাবীদের জীবনযাত্রা ও কুরবাতিদের সকল দিকগুলি অধরা থেকে গেছে। বৃহত্তর কাজ করার সুযোগ হলে এই বিষয়টি নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে কাজ করার আশা রাখি।

নির্বাচিত চিত্র

চিত্র১

মহরমের মাতম অনুষ্ঠান

হাজার দুয়ারী, মুর্শিদাবাদ

চিত্র ২

আলম ও ইমাম হোসেনের কাল্পনিক চিত্র

চক মসজিদ মোড়, মুর্শিদাবাদ

চিত্র ৩

ইরানী ইমামবাড়ি

চক মসজিদ মোড়, মুর্শিদাবাদ

চিত্র ৫

গাজি আব্বাসের স্মরণে কাল্পনিক কর্তন করা হাত

ইরানী ইমামবাড়ি, মুর্শিদাবাদ

চিত্র ৬

'আগ কা মাতম' করার স্থান

দক্ষিণ গেট, মুর্শিদাবাদ

চিত্র ৭

বাহাত্তর শহীদের নাম

ইরানী ইমাম বাড়ী, মুর্শিদাবাদ

চিত্র ৮

তাবুত

ইরাণী ইমামবাড়ি, মুর্শিদাবাদ

গ্রন্থপঞ্জী

আলি, কে (২০০৩)। *ইসলামের ইতিহাস*। ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো।

ইসলাম, ডঃ আমিনুল (২০১৬)। *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদারস্।

হাসান, এ.টি.এম রফিকুল (২০০৭) । *ইসলামী বিশ্বকোষ* (২য় খণ্ড) । কলকাতা: মুসলিম লাইব্রেরী।

কোলে, অপূর্ব (২০০৫)। *বাংলা ছন্দশিল্প: প্রসঙ্গ অনুসঙ্গ*। কলকাতা: সায়ন্তিকা প্রকাশন।

চৌধুরী প্রনব (২০১৫)। *ছন্দ ও অলংকার পরিচয়*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

হান্নান, মোহম্মদ (১৯৯৫)। *বাঙালি মুসলমানের পদবী*। ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী ।

বিশ্বাস, নুরুল আমিন (২০১১)। *মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানস*। কলকাতা: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন।

গঙ্গোপাধ্যায়, অভীক(২০১৪)। *সাহিত্যের সংরূপ: পাশ্চাত্য প্রেক্ষিত*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ।

হোসেন, মীর মশাররফ (১৯৯৮)। *বিষাদ সিন্ধু*। ঢাকা: অবসর।

আবেদীন, মোঃ শামসুল (২০১৬)। *স্মৃতি নিয়ে কারবালা* । মুর্শিদাবাদ, কাদোয়া।

মহম্মদ যাকারিয়া, আবুল কালাম (অনূদিত) (২০০৫)। খান তাবাতবায়ি, সৈয়দ গোলাম। *সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ।

জামিল, তারিক (২০১০)। *আলোকিত নারী*। কলকাতা: রহমানিয়া প্রকাশনী।

রুহুল আমিন, মোহাম্মদ (১৪০৮ বঙ্গাব্দ)। *ইমাম হাসান হোসায়েন*। কলকাতা: নিউ প্রেস।

সন্নাসী, মলয় (-) । *মুর্শিদাবাদের করুণ কাহিনী*। কলকাতা: অর্পিতা প্রকাশনী।

দাস, রবীন্দ্রনাথ (-) । *ইতিহাসের আলোকে মুর্শিদাবাদ*। কলকাতা: রোহিনী নন্দন প্রকাশনী।

রায়, নিখিলনাথ (-) । *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস*। কলকাতা: অর্পিতা প্রকাশনী।

ইংরেজি বই

Sarkar, Jadu Nath (1972). *Bengal Nawabs.* Calcutta: The Asiatic Society.

Das, Debasri (2008). *Murshidabad: A Study of Cultural Diversity.* Kolkata: Arpita Prakashani.

Hyder, Sayed Akbar (2005). *Reliving Karbala: Martyrdom in South Asian Memory.* New York: Oxford University Press.

Hitti, Phillip.k. (1970). *History of The Arabs.* London: Macmillan.

Lewis Bernard (1993). *The Arabs in History.* New York: Oxford University Press.

Holtz.P.M, Lambton. Ann K. (1970). *History of Islam.* vol- 1A. Cambridge University Press.

Holtz.P.M, Lambton. Ann K. Lewis Bernard (1970). *History of Islam.* vol-2B. Cambridge University Press.

Holister, John Norman (1979). *The Shi'a of India.* New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation.

Brown Daniel (1963). *A New Introduction to Islam.* New Delhi: Atlantic Publishers.

John Middleton (1995). *Africa and the Middle East.* G.K. Hall Company.

বৈদ্যুতিন উৎস

https://www.sahapedia.org/jarigaan-

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%93_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A6%A3

http://murshidabad.net/history/history-topic-mir-jafar.htm

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Imam_Husayn_Shrine

http://www.historydiscussion.net/history-of-india/history-of-bengal/bengal-under-the-rule-of-nawabs-a-close-view/5931

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shuja-ud-Din_Muhammad_Khan

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Murshid_Quli_Khan.html

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Alivardi_Khan.html

https://m.mapsofindia.com/who-is-who/history/alivardi-khan-amppage.html

https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_Hyderabad

http://www.mpositive.in/tag/saadat-khan-burhan-ul-mulk-governor-of-awadh/

http://lucknow.me/Saadat-Khan_Burhan-ul-Mulk.html

http://murshidabad.net/history/history-topic-mir-jafar.htm

https://www.al-islam.org/story-of-the-holy-kaaba-and-its-people-shabbar/first-imam-ali-ibn-abu-talib

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/cultural-history-themes/sunni-and-shia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_Shia_Islam

http://www.sacred-destinations.com/iraq/najaf

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mahdi

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arba%27een_Pilgrimage

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zaynab_bint_Ali

https://jafrianews.com/14-masoomeen/bibi-sakina-a-s-the-youngest-hashimite-princess/

https://www.britannica.com/topic/flagellation

https://www.slickpic.com/blog/photographing-gajan-religious-hindu-festival-rural-bengal-night-low-ambient-light-relevant-techniques/

https://www.utsavpedia.com/fashion-cults/nawabs-of-awadh/

http://www.iranicaonline.org/articles/gypsy-i

https://en.wikipedia.org/wiki/Gypsies_in_Iraq

https://en.wikipedia.org/wiki/Ghorbati

https://en.wikipedia.org/wiki/Nawar_(people)

https://www.scoopwhoop.com/European-Gypsies-Are-Descendants-Of-Indian-Dalits-Who-Migrated-1400-Years-Ago/#.tsl8qifnc